

# আমার লাদাখ যাত্রা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

# আমার লাদাখ যাত্রা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন



সাইকেল লিমিটেড

১২ বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭০

**AMAR LADHAK YATRA**  
Bengali translation of Rahula Sankrityayan's travelogue  
*Meri Ladhak Yatra*

© কমলা সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদ  
মলয় চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ  
আগস্ট ২০০২ ॥ ভাদ্র ১৪০৯

প্রকাশক  
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়  
চিরায়ত প্রকাশন গ্রাইভেট লিমিটেড  
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অঙ্কর-বিন্যাস  
কম্পোজিট  
৩৪/২ বাজেশিবপুর রোড, হাওড়া ৭১১ ১০২

মুদ্রাকর  
ইম্প্রিণ্ট  
দূরভাষ : ২৪১-৩৫২৩

প্রচ্ছদ  
মানব দত্ত

ISBN 81-85696-50-0

দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র  
Rs 35 Only



আমার লাদাখ যাত্রা

## সূচিপত্র

গ্রন্থপ্রসঙ্গে ৭	
মিরাট ৯	
পাঞ্জাব ১১	
• মুলতান ১৩	
ডেরাগাজিখাঁ ১৬	
সীমান্ত ভ্রমণ ১৯	
পুনছ রাজ্য ২৯	
কাশ্মীর ৩০	
জোজিলা অতিক্রম ৪০	
লাদাখ ৪৫	
লাহুল ৬১	
কুলু ৮৬	

### গ্রন্থ প্রসঙ্গে

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ছিলেন একাধারে বিখ্যাত দার্শনিক, ইতিহাসকার, পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একজন অগ্রণী সৈনিক। কিন্তু তাঁর এই সমস্ত পরিচয়কে ছাপিয়ে যে পরিচয়টা বড় হয়ে দেখা দেয়, সেটা হলো তাঁর ভবঘুরে চরিত্র, যাকে তাঁরই ভাষায় বলা যায় ‘ঘুমক্কর’। ভারতবর্ষের সমস্ত সুগম ও দুর্গম অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করেছেন, ভারতের বাইরে এশিয়া ও ইউরোপেরও বহু দেশ তাঁর ভবঘুরে জীবনের সাক্ষী হয়েছে। তিনি শুধু পরিব্রাজকের ভূমিকা পালনেই সন্তুষ্ট থাকেননি। অধিকাংশ ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। হিন্দী ভাষায় ভ্রমণ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁকেই পথিকৃৎ মনে করা হয়। তিনি এশিয়ার দুর্গম ভূখণ্ড তিব্বতে গিয়েছেন একাধিকবার। আর আমাদের দেশেরই একটা অংশ, ভৌগোলিকভাবে যা তিব্বতেরই লাগোয়া এবং আচার ব্যবহার, ভাষা, সংস্কৃতির দিক থেকে তিব্বতেরই একটা প্রতিক্রম এবং তিব্বতের মতোই দুর্গম, সেই লাদাখেও কয়েকবার গিয়েছেন। তাঁর যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য, দর্শন ও বিচারশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুসন্ধান করা। কিন্তু সে-সব কিছুই অতিরিক্ত হিসাবে আমরা পেয়েছি তাঁর লেখা—‘আমার লাদাখ যাত্রা’ গ্রন্থটি। এই ভ্রমণ কাহিনিটি আমাদের দেশের সেই অঞ্চলে নিয়ে যাবে যেখানে রয়েছে অন্য এক ভারত। যেখানে এখনও পবিত্র গুম্ফায় বা মঠে উচ্চারিত হয় ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি’ কিংবা ‘ওঁ মণিপদমে হুঁ’ মন্ত্র।

রাহুলজি উত্তরপ্রদেশের মিরাত থেকে যাত্রারস্ত্র করে, আশ্বালা, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হয়ে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের অনেকটা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বর্তমানে পাকিস্তানে এবং সাধারণভাবে আমাদের কাছে অগম্য—রাহুলজি তাঁর ভ্রমণ-লিপিতে ওই সমস্ত জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই বর্ণনার মধ্যে বেশ কিছুটা কটুত্ব আছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষটি ওই অঞ্চলে তখন মহীকর হয়ে দেখা দিয়েছিল, যার ফলে ওখানকার সংখ্যালঘুদের (হিন্দু) জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার বর্ণনা কালে রাহুলজির মনোভাব কিছুটা তিক্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

লেহ্ লাদাখের প্রধান শহর। অনেক আগে যখন লাদাখ স্বাধীন রাজ্য ছিল, তখন লেহ্ ছিল তার রাজধানী। লেহ্‌তে বিমান বন্দর আছে এবং লেহ্ বিমান বন্দর বিশ্বের উচ্চতম বিমানবন্দরের একটি। কাশ্মীরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অলিখিতভাবে তিনটি ভাগ আছে। জম্মু হিন্দু প্রধান, শ্রীনগর উপত্যকা মুসলমান প্রধান এবং লাদাখ অবতল বৌদ্ধ প্রধান। শ্রীনগর থেকে সোনমার্গ হয়ে জোজিলা পার হয়ে স্থল পথে লাদাখে যাওয়া যায়, আবার কুলু-মানালি থেকে লাহুল হয়েও লাদাখে যাওয়া চলে। এখন এখানে মোটর চলাচলের রাস্তা হয়েছে কিন্তু রাহুলজি যখন ওখানে গিয়েছিলেন তখন অশ্ব এবং অশ্বতরই ছিল যাতায়াতের একমাত্র বাহন, অন্যথায় হাঁটা। যাত্রাপথে সিঙ্কু, চন্দ্রা, ভাগা, চন্দ্রভাগা ও বিপাশা নদী অতিক্রম করতে হয় একাধিকবার। একসময় ওখান থেকে গিলগিট হয়ে চিনা তুর্কিস্তানের ইয়ারকন্দ পর্যন্ত যাতায়াতের পথ ছিল এবং ইয়ারকন্দে অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দোকানপাট ছিল। রাহুলজির এই বইটি পড়ে পাঠকেরা লাদাখ সম্বন্ধে উৎসাহী হবেন, এরকম আশা করা যেতেই পারে।

দি বড়বাজার লাইব্রেরি, তাঁদের সংগ্রহ থেকে মূল গ্রন্থটির সম্পূর্ণ প্রতিলিপি তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই বইয়ের অনুবাদ করা হয়তো সম্ভবই হতো না। ওই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কলকাতা

জুলাই ২০০২

মলয় চট্টোপাধ্যায়



## মিরাট

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই আমি মিরাট চলে এসেছিলাম। মিরাট জেলার অবস্থান গঙ্গা এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে। দিল্লী এবং গাজিয়াবাদের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা যমুনা এই জেলার সীমানা। যমুনার পশ্চিমে রোহতক জেলা।

যুক্ত প্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশ—অনুঃ) অন্য অনেক অঞ্চলের চেয়ে মিরাট কমিশনারির লোকজন বেশ সুখে সম্পদে আছে। আমার মতে এর প্রথম কারণ হলো গঙ্গা এবং যমুনা থেকে প্রচুর খাল কেটে জালের মতো এখানকার খেত-খামারে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেজন্য ফসলের উৎপাদন বেড়েছে অনেক গুণ, দ্বিতীয় কারণ এখানকার কৃষকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং তৃতীয় কারণ বাংলা বিহারের মতো এখানে বড় বড় জমিদার নেই।

প্রাচীন কালের কুরুদেশ ছিল এই অঞ্চলে। বর্তমানে হস্তিনাপুর গঙ্গাতট থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে সরে গিয়ে গঙ্গারই এক শুষ্কপ্রায় ধারা বুড়ীগঙ্গার কিনারায় অবস্থান করছে। এই জায়গাটিও তীর্থযাত্রীদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হতে পারত। কিন্তু মানুষের অবহেলায় স্থানটি তীর্থস্থানে পরিবর্তিত না হয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এই জায়গার কাছাকাছি অঞ্চলে এখনও বড় বড় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। যে-সব টিলার নিচে এই ধ্বংসাবশেষ লুকানো আছে লোকে তার কোনোটির নাম দিয়েছে বিদুর টিলা, কোনোটির হয়তো অন্য নাম। আসলে জায়গাটিকে বিখ্যাত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাটোয়ারিদের কোবালায় এখনও কোনো কোনো জায়গাকে ‘পট্টি কৌরবান’ অথবা ‘পট্টি পাণ্ডবান’ লেখা পাওয়া যায়। এখান থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এলাকাকে সদর (দিয়ারা) বলা হয়। এই অঞ্চলে অনেক গোত্র মোষের বাথান আছে। হস্তিনাপুর নামে এখন বিশেষ কোনো একটি গ্রাম নেই। জৈন ধর্মের দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর, উভয় সম্প্রদায়েরই দুটো বড় বড় মন্দির আছে। কয়েক বছর আগেও এখানে ঋষম ব্রহ্মচার্যশ্রম নামে একটা গুরুকুল (গুরুর আশ্রমে বাস করে প্রাপ্ত শিক্ষা) ছিল কিন্তু যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেটি এখানকার পাট উঠিয়ে জয়পুরে চলে গিয়েছে। মন্দিরের একান্তবাসী পূজারীরা যাত্রার কটা দিন বাদ দিলে সারা বছরই মনঃকষ্টে কাটান। তাঁদের মধ্যে একজন অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বললেন— তখনকার সময় কত ভালো ছিল। একশতর বেশি ব্রহ্মচারী এবং বিশটি অধ্যাপক পরিবার এখানে

থাকত। রাত্রিতে খালি পড়ে থাকা কুঠুরিগুলোতে তখন আলো ঝলমল করত। অধ্যাপকরা যেখানে থাকতেন, সেখানকার অধিকাংশ ঘরই ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। পাশের এক টিলায় রঘুনাথ রাওয়ের মহল। বলা হয় যে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হবার পর মারাঠা পেশোয়াবংশীয় রঘুনাথ রাও জীবনের অন্তিম দিনগুলো এখানেই কাটিয়েছেন। মহলের একদিকের দেয়ালে একটি মার্বেল পাথরের নগ্ন মূর্তি আছে। কোথাও কোথাও ইট, চুন, সুরকি, বালি ইত্যাদি দিয়ে মেরামতির কাজ চলছে, তবে খুবই টিমোতালে। শুনলাম জৈন গুরুকুল এ জায়গা দখলে রাখার জন্য মেরামতির কাজ করাচ্ছেন। মন্দিরের পূর্বদিকে অল্পদূরে কর্ণঘট।

মিরাট থেকে ষোলো-সতেরো মাইল দূরে মবানা কসবা। এখানে তহসিল, মিডল ভার্নাকুলার স্কুল, একটি মিডল ইংলিশ স্কুল এবং একটি হাসপাতাল আছে। মবানা থেকে হস্তিনাপুর সামান্য পাঁচ-ছ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত। সেখান থেকে আট-ন মাইল দূরে পরীক্ষিৎগড়। পরীক্ষিৎগড় এখন দিনকে দিন অবনতির দিকে চলেছে। এক ভগ্ন-প্রায় দোকানে বসে এক বৃদ্ধ তামাক টানতে টানতে বলছিল কোনো সময় এই এলাকা খুবই জমজমাট ছিল। তখন সব কিছুর কারিগররাই এই পরীক্ষিৎগড়ে বাস করত। সাতান্ন সালের গদরের সময় ইংরেজরা এই এলাকার বাইরের দিকের প্রাচীর কামান দেগে ধ্বংস করে দেয়। এখানকার রাজার কেদা আজ যেমন ভগ্নস্থূপের মতো দেখাচ্ছে, চিরকাল এমনটা ছিল না। এক কালে এই কেদা অনেক সুন্দর অনেক জমকালো ছিল।

এদিকে এক ক্রোশের হিসাব ধরা হয় সওয়া মাইলে। পরীক্ষিৎগড় থেকে তিন মাইল দূরে খৃষ্টানদের প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুল আছে। অন্য কোনো যানের অভাবে আমরা গোকরগাডি করেই সেটিকে দেখতে গেলাম। গ্রামের মধ্যে একটা কাঁচা মাটির বাড়ির ছাদে একটা ক্রস টাঙানো দেখলাম। জিঙ্কস করে জানলাম যে এতদঞ্চলের সমস্ত ভাস্কিরাই (মেথর) খৃষ্টান হয়ে গেছে। এই বাড়িটা তাদেরই গির্জা। গির্জার পাদরি এবং তাঁর স্ত্রী বাইরে প্রচারে বেরিয়েছেন। গ্রামটা ‘তগা’ প্রধান গ্রাম। এদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ভূমিহারদের তুলনা করা চলে। এরা পুরোহিতের কাজ করে না। এক তগা বেশ অহঙ্কার করে বলছিল যে—সব জমিদারিকেই দেখলাম একদিন না একদিন বিকিয়ে যেতে। কিন্তু তগাদের জমিদারিকে নয়। জাঠ পূজারীদের মতো তগাদের নামের পাশেও আজকাল ‘চৌধুরী’ বসাতে হয়। এদের গ্রামের চল্লিশটি ভাস্কি পরিবার খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে বলে এদের কোনো আপশোষ নেই। এমনিতাই তগারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভাস্কি চামারদের স্কুলে পড়তে পাঠায় না। জেলা বোর্ড অস্পৃশ্যদের জন্য আলাদা একটা অচ্ছুত পাঠশালা অনুমোদন করেছে, কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা তার জন্য জমি দিতে রাজি নয়। বলে—চামার, ভাস্কিদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ময়লা পরিষ্কার করবে কারা আর জুতোই বা কারা বানাবে?

গ্রাম থেকে কিছু দূরে খৃষ্টানদের তৈরি মেয়েদের স্কুল। স্কুলটি লোকবসতি থেকে দূরে চাষের জমির কাছাকাছি। একদম গ্রাম্য ধরনের লম্বা মতো কাঁচা বাড়ি, এই বাড়িতেই স্কুল বসে। এক ইংরেজ মহিলা স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা। স্কুলটি মিডল ভার্নাকুলার পর্যন্ত। সঙ্গে ট্রেনিং-এর ক্লাসও হয়। ট্রেনিং ক্লাস বাদ দিয়ে প্রায় সত্তরটি মেয়ে মিডল ভার্নাকুলার পড়ছে। এখানকার সমস্ত ছাত্রীই এসেছে মূলত চামার ও মেথর সম্প্রদায় থেকে। হিন্দুদের কাছে চরম উপেক্ষিত এবং সর্বদা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা সম্প্রদায়ের এই মেয়েদের পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, গুছানো, সাজানো ঘর গৃহস্থালী ইত্যাদি দেখে আমার এক সঙ্গী মন্তব্য করল—এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং রুচিবোধ,

উঁচু জাতের শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেও দেখা যায় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাপন করার এবং মিতব্যয়িতার শিক্ষা এদের দেওয়া হয়। আহাৰ্য—নিতান্তই সাধারণ, স্কুলের মেয়েরাই তৈরি করে। কাপড় বোনা, বাঁশ ও বেতের খুড়ি বানানো, মোজা তৈরি করা এবং নানা ধরনের সেলাইয়ের কাজ মেয়েরা এখান থেকে শিখছে। হিন্দু সমাজে যারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবনযাপনে বাধ্য হয়, সেই অস্পৃশ্যদের পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করার যে প্রয়াস এখানকার খৃষ্টান ভাইয়েরা করছে, তা দেখে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নত হয়ে এল। এই মেয়েরা যখন হিন্দু ছিল তখন কি ধরনের জীবনযাপন করত আর এখন কি হয়েছে? মিরোটের বাইরে নয়-দশ মাইল দূরে লোকবসতি ছাড়িয়ে এই সরস্বতীর মন্দিরটি সত্যিই সুন্দর জায়গা। অস্পৃশ্য জাতির কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু এত সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা বিহারের হিন্দু সমাজেও দেখতে পাওয়া যায় না। এছাড়াও মিরোট শহরের বাইরে একটি কুষ্ঠরোগ সেবা কেন্দ্র আছে এবং সেটিও খৃষ্টানরাই পরিচালনা করে। সেখানকার কাজকর্ম দেখলে বোঝা যায় যে পৃথিবীতে খৃষ্টান জাতি কেন অন্য জাতিকে পিছনে ফেলে সব বিষয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যেখানে হিন্দুরা তাদেরই জাতির একাংশের প্রতি এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুষে রেখেছে সেখানে খৃষ্টানরা তাদেরকেই কাছে টেনে প্রেম আর সহানুভূতি দিয়ে তাদের নতুন জীবন গড়ায় প্রেরণা দিচ্ছে।

## পাঞ্জাব

প্রকৃতপক্ষে, আঞ্চালা থেকেই পাঞ্জাবের আরম্ভ। এমনিতে রোহতক, কার্নাল, হিসার, গুরগাঁও (বর্তমানে হরিয়ানা রাজ্য—অনুঃ) প্রভৃতি জেলা পাঞ্জাবের মধ্যে রয়েছে কিন্তু ওই সব অঞ্চলের লোকের ভাষা, বেশভূষাতে পাঞ্জাবের চেয়ে মিরোট কমিশনারির লোকের সঙ্গেই বেশি মিল দেখতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে আঞ্চালা সহ উপরোক্ত জেলাগুলিতে এবং মিরোট কমিশনারির মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার সত্তর থেকে আশি ভাগ। এই সব অঞ্চলই দিল্লীর অত্যন্ত কাছে এবং যেখানে আলাউদ্দীন, মুহাম্মদ তুঘলক, আওরঙ্গজেব ইত্যাদিদের মতো মতাক্ষ, অত্যাচারী সুলতান বা বাদশাহরা কয়েক শত বছর ধরে শাসন করেছে। তাহলে এই অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যার এরকম বৃদ্ধির রহস্য কি? মনে হয় এতদঞ্চলের হিন্দুরা পূর্ববাংলার হিন্দুদের মতো অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা ছিল না, এবং এই অঞ্চলে রাজপুত ছাড়াও জাঠ, আহীর, গুজর প্রভৃতি ক্ষাত্র স্বভাবের জাতির বসবাস ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান ছিল তগা বা দানত্যাগী। যাদের বিহার অঞ্চলের ভূমিহার সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তারাও এখানে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল বা এখনও আছে। এরা দেশ, কালের পরিস্থিতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কৃষিকাজ ছাড়া ব্যাবসা বাণিজ্যেও এরা বেশ এগিয়ে। সমাজ সংস্কারমূলক কাজেও এরা প্রতিবেশীদের মতোই সক্রিয়। শোনা যাচ্ছে যে আঞ্চালা ছাউনি (ক্যান্টনমেন্টে) এবং মিরোট কমিশনারিকে দিল্লীর সঙ্গে জুড়ে দেবার একটা পরিকল্পনা নাকি গভর্নমেন্টের আছে। যদি সেটা হয় তাহলে জাঠেরা হবে এই অঞ্চলের সংখ্যাগুরু তারপরই আসবে দানত্যাগীরা। জাঠ জাতির সরলতা নিয়ে এ অঞ্চলে অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে, যেমন আছে বিহারে আহীরদের নিয়ে। তবে বর্তমানে জাঠরা অত সহজ সরল নেই। বিগত পঁচিশ বছরে তাদের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। অধিকাংশ জাঠরাই পাঞ্জাবের হরিয়ানা অঞ্চলে বাস করে। একদিন সেই অঞ্চলে দুধ মাখনের শ্রোত বইত,

এরকম জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এখনও সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই অঞ্চলেই দুধ মাখনের উৎপাদন এবং ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। এখানকার হাসি-হিসার জেলা উৎকৃষ্ট জাতির গোরু মোয়ের জন্য বিখ্যাত। সামাজিক চিন্তাধারা ও বিচারের পরিবর্তনের জন্য এখানকার আর্য়সমাজের প্রয়াসের প্রশংসা করতেই হয়। আর্য়সমাজের প্রভাব জাঠদের মধ্যে যথেষ্ট। এখানে অনেকগুলো জাঠ-বৈদিক হাইস্কুলের উপস্থিতি তারই প্রমাণ দেয়। আর্য়সমাজীরা তাদের মতাদর্শকে এখানে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পেরেছে। বৈদিক স্কুলগুলো ছাড়াও, গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, কুরুক্ষেত্র মন্দিরের স্থাপনা, আর্য় সমাজের বাণী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একেই তো এই জাতি অত্যন্ত নির্ভীক, তার ওপরে ক্ষত্রগুণ প্রধান আর্য় সমাজের দর্শনে বিশ্বাস, এদেরকে অন্যদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে।

শিক্ষা বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, সংস্কৃতে ‘শ্রাস্ত্রী’ উপাধিধারী অনেকে এদের মধ্যে আছেন। আবার উচ্চ ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যাও যথেষ্ট এবং সেটা ক্রমবর্ধমান। প্রত্যেক জাঠ পরিবারই সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তোলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। এদের শিক্ষার হাল হকিকতের সঙ্গে যখন বিহারের আইরদের শিক্ষার তুলনা করি, তখন দুঃখ হয়। আগামী দিনে দিল্লী প্রদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এই জাতির যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা থাকবে বলেই আমার ধারণা।

আম্বালা থেকে পশ্চিমে এগিয়ে লুধিয়ানা, জলন্ধর, অমৃতসর, শেখপুরা, লায়ালপুর, শিয়ালকোট, বেলম, রাওয়ালপিন্ডি, অটক প্রভৃতি জেলাগুলিতে হিন্দু জনসংখ্যা এমনভাবে কমতে শুরু করেছে যে এরপর তাদের একমাত্র শহর আর শহরতলীতেই দেখা যাবে, গ্রামে নয়। রাওয়ালপিন্ডি জেলায় কাছটা এবং কেহমরী, এই দুই তহসিলেই কেবল কিছু কৃষক গ্রামে বাস করে। এদের অধিকাংশই সারস্বত ব্রাহ্মণ আর বাকিরা ভূমিহার। এদের মধ্যে শিক্ষার অভাব প্রচণ্ড। এরা হাল বলদ নিয়ে মাঠে চাষ করে, গাধা পালন করে। এখানে এরকম ব্রাহ্মণও বেশ কয়েকশো পাওয়া যাবে যারা আজন্ম উপবীত ছাড়াই ব্রাহ্মণ। তাদের বেশভূষা, আহার-বিহার অনেকটাই মুসলমানদের মতো। মাংস মুরগিতে প্রায় কোনো ব্রাহ্মণেরই অরুচি নেই। বাল্যবিবাহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। পর্দাপ্রথার কোনো চিহ্ন নেই। সাধারণভাবে লোকজনের সামনে সর্বজনীন নদী কিংবা পুকুরঘাটে কিংবা কুয়োতলায় মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে উলঙ্গ হয়ে স্নান করে। উলঙ্গ অবস্থাতেই জামা কাপড় ধোয়। এই জেলার জেলাবোর্ডের সমস্ত সদস্যই মুসলমান। তাঁরা শিক্ষা সহ যে কোনো বিষয়ে হিন্দুদের উপেক্ষা করেন।

### অটক

সিন্ধুনদের তীরে অটক একটি পার্বত্য জেলা। এখানে লোক বসতির কাছে সিন্ধুর ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ। যখন কোনো যাত্রী বা পর্যটক অটকের কেল্লার নিচে দিয়ে প্রবাহিত সিন্ধুর তীরে পড়ে থাকা অজস্র প্রস্তর খণ্ডের কোনো একটির ওপরে বসে ওপারের দিগন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করবে, তখন মনে মনে সে সেই অতীত যুগে চলে যাবে যখন হাজার হাজার হুন, যবন, শক, তুর্ক, মুঘল জাতি ওই পাহাড় ভেদ করে এই পৃথিবীর তীরে এসে উপস্থিত হতো। হয়তো কতবার সিন্ধুনদ ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন রাখার জন্য ওই বহিরাগতদের সামনে অনেক বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রতিবারই তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ভারতবর্ষের বিশৃঙ্খল জনতা একমাত্র

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় ছাড়া আর কবে সিঙ্কুনদকে তার কাজে সাহায্য করেছে? আজ ইতিহাসের সেই বিখ্যাত অটক নগর আর নেই। সে জায়গায় সামান্য কয়েকটি গ্রাম মাত্র আছে। রেললাইন তার সমস্ত শ্রী হরণ করে নিয়েছে। সাতশো ঘর হিন্দুর মধ্যে বারো-চোদ্দ ঘর কোনো মতে টিকে আছে। যেখানে কাবুল বিজেতা মানসিংহ কয়েকশো ঘর রাজপুতকে এনে এখানে বসিয়েছিলেন সেই মালাহিটোলায় আজ একঘর হিন্দুও নেই। নদীর কিনারায় আস্তানা গাড়া এক সাধুবাবা বললেন— কিছুদিন আগেও দু-চার ঘর ছিল।

## তক্ষশিলা

তক্ষশিলা নগর রাওয়ালপিন্ডি এবং হাজারা জেলার সীমানায়। তক্ষশিলা এখন রেলওয়ের একটি জংশন স্টেশন। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান। এক কালে প্রাচীন গান্ধার দেশের রাজধানী ছিল এই তক্ষশিলা। এখানকার রাজা অস্তি অগ্রণী হয়ে আলেকজেন্ডারকে এদেশের বৃকে স্বাগত জানিয়েছিল। তক্ষশিলার প্রকৃত মাহাত্ম্য নগর বা রাজধানী রূপে নয়। এই জায়গা প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ্তন্ত স্বরূপ ছিল। এখান থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ত দেশের সুদূরতম প্রান্তে। গান্ধার সন্তান বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ পাণিনির জন্মস্থান এই তক্ষশিলা। ন্যায়াশাস্ত্রবিদ পতঞ্জলি এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ বহু স্থানে বহুবার তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল খ্যাতির উচ্চতম সোপানে। বৈশালীর (বনিয়াবশার জেলা — মজফ্ফরপুর) নগরবধু অশ্বপালী এবং মগধরাজ বিন্ধিসারের পুত্র প্রখ্যাত ভিষক জীবক এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। এক সময় কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের আশায় পদব্রজে কাশী থেকে এখানে এসেছিলেন। আজ সেই জায়গা উজাড় হয়ে ভগ্নস্তূপে পরিণত। দূরে দূরে শহরের চারধারে বেশ কিছু উঁচু টিবি মতো আছে। সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ওই টিবিগুলোর কয়েকটিকে খুঁড়ে অনেক ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার করেছে। তক্ষশিলার চারপাশের গ্রামগুলোতে এখনও এই খনন কাজ চলছে। সম্রাট কনিষ্ক প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজিকা স্তূপ এখনও চিঙতোপ নামে প্রতিষ্ঠিত আছে। স্তূপের পাহাড়াদার বৃদ্ধ মুসলমান চৌকিদার বেশ খোস মেজাজেই বলল— ‘মূর্তি ভাঙাই তো ইসলাম ধর্মের বিধান। কিন্তু আমি সরকারি চাকর, মূর্তি ভাঙলে চাকরি চলে যাবে।’ কি আপশোশের কথা। যার পূর্বজরা কয়েক যুগ বা কয়েক শতাব্দী আগে এই সমস্ত এলাকায় এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। আজ অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থেকে তাদের বংশধরেরা সেই অতীত গৌরবকে উপলব্ধি করতে পারে না। তক্ষশিলায় এই সব বিচ্ছিন্ন বিস্তৃতভাবে ছড়ানো ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে দেখলে প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের মনেই এক বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি হয়।

## মূলতান

### লায়ালপুর

এটি একটি নতুন জেলা। মাত্র বছর তিরিশ হয়েছে এর। সমগ্র জেলার প্রতিটি অঞ্চলেই খাল কাটা হয়েছে। জায়গায় জায়গায় বালির স্তূপ আর বাবলা জাতীয় কাঁটা গাছের ঝাড়। এখানকার লোকেরা শুনে আশ্চর্য হয় যে কোনো দেশে খাল না থাকলেও চাষবাস হয়। ধরিত্রী শস্যশ্যামলা হয়।

এখানকার অধিকাংশ কুয়োর জলই ক্ষারযুক্ত। সেইজন্য পানীয় হিসাবেও খালের জলই ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাব প্রদেশের কৃষি কলেজটি এখানেই অবস্থিত। দেহাতী কৃষকদের মধ্যে শিখ আর জাঠদের সংখ্যাই বেশি। নতুন অকালি আন্দোলনও এখানে ভালোমতোই শিকড় গেড়েছে। শিখদের মধ্যে কিছু বিশেষ দোষ আছে যা দূর করার জন্য অকালি আন্দোলন তেমন বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এখানকার লোক মদের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কোনো মেলা কিংবা বিয়ে শাদি উপলক্ষে এস্তার মদ্যপান এবং তারপর মত্ততাজনিত কারণে কলহ বিবাদ, লাঠালাঠি, কখনও কখনও খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়। অকালি আন্দোলন বস্তুতপক্ষে তাঁদের সমর্থকদের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকে। যার ফলে এই আন্দোলনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অপরাহু বেলায় সূর্যের মতো, যার উত্তাপ অনেক কম তার ওপরে সাম্প্রতিক কালে এই আন্দোলনের মধ্যে নানা ধরনের গোষ্ঠীকলহ দেখা দিয়েছে। যাই হোক, এটা মানতেই হবে যে মদ্যপানের আসক্তি এখানকার অধিকাংশ কৃষককেই গ্রাস করেছে। খেত বেশিরভাগই গমের। পাঞ্জাবে যত মোটর গাড়ির ব্যবহার বোধ হয় সারা ভারত মিলিয়েও তার সমান হবে না। লায়ালপুরের মতো তিরিশ বছরের এক নবীন জেলা শহরেও একশোটির বেশি মোটর গাড়ি আছে। মোটর গাড়ির মালিকেরা মামুলি ফোর্ড গাড়ির বডি কিছু কমিয়ে বাড়িয়ে বারোজনের বসার মতো জায়গা তৈরি করেছে। আর এর ফলে শহরের একা, টাঙা চালকদের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষণ দেখে যা মনে হচ্ছে সেদিন আর বেশি দূরে নেই যখন এখানে শুধু মোটরই চলবে।

### মুলতান

সিন্ধু আর শতদ্রুর মাঝখানে পাঁচটি তহসিল নিয়ে এই জেলা গঠিত হয়েছে। মুলতানের গরম বিখ্যাত। আর হবেই বা না কেন? একসময় এখানকার সবচেয়ে বড় দেবতাই ছিল সূর্য। আর এখানকার মুসলমানদের পীর শকস্ (সূর্য) ও যথেষ্ট খ্যাত। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে, যখন পাঞ্জাবের অন্যত্র দিনের বেলাতেও বেশ শীত শীত ভাব থাকে তখনই এখানে গরমের হাঁকডাক শুরু হয়ে যায়। জেলার অবস্থান কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে নয়। আমি এখানে একটা বাড়ি দেখলাম যার ছাদ পাতলা শন বা খড় জাতীয় কিছু বিছিয়ে তার ওপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি হয়েছে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম— এত পাতলা মাটির প্রলেপ বর্ষার জল আটকাবে কি করে? লোকটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল— এখানে সেরকম বৃষ্টি কই। সামান্য কয়েক ফোঁটাতেই বর্ষা শেষ। এবার অবাক হবার পালা ছিল আমার—তাহলে এত চাষের খেত বাগ বাগিচা? উত্তর পেলাম— সবই খাল আর কুয়োর দৌলতে।

যদিও এখানে খুব সামান্যই বৃষ্টিপাত হয়, তাসত্ত্বেও কুয়োর জলস্তর খুব একটা নিচে নামে না। এখানকার লোকেরা জলের কদর খুব বোঝে এবং কুয়োগুলিকে বারোমাসই ব্যস্ত রাখে। মুলতানের অবস্থান ঠিক পাঞ্জাব আর সিন্ধু প্রদেশের সীমানায়। এজন্য উভয় প্রদেশেরই প্রভাব এখানকার জীবনযাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার পোশাকে সিন্ধীদের ঘাগরিও যেমন আছে তেমনই পাঞ্জাবের সালোয়ারও আছে। গ্রামের দিকে মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যাই বেশি। কোথাও কোথাও কিছু হিন্দুকে চাষ আবাদ করতে দেখা যায়। হিন্দুদের বেশিরভাগই শহরে থাকে। হয় চাকরি করে না হয় ব্যাবসা। ভাষা না পাঞ্জাবী না সিন্ধী। এখানকার শীত এবং গ্রীষ্ম

দুটোই চরম, সহোদর বাইরে। অধিকাংশ লোকেরই গায়ের রং ফর্সা। শহরে নানা ধরনের মানুষের সমীকরণ হয়েছে কিন্তু গ্রামে এখনও বেশ লম্বা চওড়া স্ত্রী পুরুষের দেখা মেলে। এখানে যারা কৃষিকর্মে নিযুক্ত তা সে ব্রাহ্মণই হোক কিংবা ক্ষত্রিয়, সমস্ত হিন্দুরাই গাধা পালন করে। ঐতিহাসিক দিক থেকেও মূলতানের বিশেষত্ব আছে। এখানকার সূর্যমন্দির এক সময় খুব বড় তীর্থক্ষেত্র ছিল। যেভাবে ভারতবর্ষের অন্য সব মন্দির তার ধনৈশ্বর্য দেখিয়ে মুসলমান লুটেরাদের ডেকে এনেছিল, মূলতানের এই সূর্য মন্দিরও তেমনভাবেই খাইবারের ওপারের দস্যুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এখন অনেক কষ্ট করে সেই মন্দিরের কোনো চিহ্ন খুঁজে বার করতে হয়। বর্তমানে গ্রন্থীদের মন্দিরটির খ্যাতিই বেশি। বর্তমান মন্দিরটিকে দেখে বেশি প্রাচীন মনে হয় না। তবে তারই লাগোয়া গৌসপীরের দরগা দেখে মনে হয়, এখানেই পুরানো মন্দিরটি ছিল। দরগার ইট বেশ পুরানো। এই দুটো ইমারতই সেই কেল্লার মধ্যে অবস্থিত ছিল যার সঙ্গে দেওয়ান শাবনমলের অমর নাম যুক্ত হয়ে আছে। শিখদের রাজ্যের পরিচালনভার ইংরেজদের হাতে আসার পরও এই হিন্দুবীর বহুদিন পর্যন্ত মূলতানের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন। আজ সেই কেল্লার একটি ইটও অবশিষ্ট নেই। কেল্লাকে ঘিরে যে পরিখার বৃত্ত ছিল তা শুকিয়ে গেছে বহুকাল। এখন সেখানে ফরাস এবং অন্যান্য বুনো গাছ জন্মেছে।

মূলতানে হিন্দুদের কয়েকটি ভালো ভালো সংস্থা আছে, মঙ্গল হোক আর্য সমাজের, যারা হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে এক সংস্কারের ঢেউ তুলে দিতে পেরেছে। আজকে পাঞ্জাবে এমন একটি শহরও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত ডি.এ.বি. হাইস্কুল নেই। মেয়েদের স্কুল সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। বরং বিপরীতভাবে বলা যায় যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, আর্যসমাজের আন্দোলনের একটি প্রধান দাবি। মূলতানের ডি. এ. বি. স্কুল একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য পাশেই আর্য অনাথালয় নামে একটি সংস্থা আছে। শহর থেকে চার মাইল দূরে গুরুকুল বিদ্যালয় আছে, যেখানে একশো তিরিশ জন ছাত্র পড়ে। শহরে একটি সনাতন ধর্মের স্কুলও আছে।

বিগত দিনে মূলতানে যে জাতিদাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার খবর সকলেরই জানা। তিন বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু সেই তিক্ত দিনগুলোর স্মৃতি শহরবাসীদের মন থেকে মুছে যায়নি। এখনও কত আশুনে পোড়া বাড়ি তার দক্ষ চেহারা নিয়ে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মেরামতি হয়নি। বাড়িগুলোর অঙ্গার হয়ে যাওয়া কাঠ আর পোড়া দেয়াল এখনও সেই বীভৎসতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। একটা মন্দিরও তখন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেটিকে আংশিকভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। অন্য জায়গার মতো এখানকার হিন্দুরাও স্বভাবত শান্ত। অধিকাংশই ব্যবসায়ী অথবা কলমজীবী। হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে জাত-পাত, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ। সেদিক থেকে মুসলমানরা অনেক মজবুত অবস্থায় আছে। একেই তো ধর্মাত্মতা তাদের মধ্যে প্রচণ্ড, তার ওপরে হিন্দুদের মতো ধনী অথচ ভীকু, শান্ত সম্প্রদায়ের তারা মুখোমুখি হয়েছে। তবে হিন্দুদের সময়ও বদলাচ্ছে। যদিও তাদের অভ্যন্তরীণ ভেদভাব এখনও দূর হয়নি তবুও তারা একটু একটু করে কাপুরুষতার খোলস ছেড়ে সাহসিকতার দিকে এগোচ্ছে, অবশ্য তার গতি খুবই মন্থর। বিগত দাঙ্গার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন মুসলমান গুন্ডাব দল হিন্দু

মহান্নায় হামলা চালাচ্ছিল, আঙুন লাগাচ্ছিল তখন সেই খবর পেয়ে আর্থসমাজীরা ভাবল এরপর গুন্ডারা তাদের মন্দির অপবিত্র করবে বা ধ্বংস করবে। সেজন্য মুহূর্তের মধ্যে লাঠি হাতে এক বিশাল জনতা মন্দির রক্ষার জন্য গলির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। গুন্ডারা এসেও ছিল, কিন্তু প্রতিপক্ষের জম্মায়েত দেখে এগোবার সাহস দেখায়নি। গভর্নমেন্ট পরে এই দাঙ্গার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ওপর মাথাপিছু এক টাকা করে জরিমানা ধার্য করে। জরিমানার টাকা সেইসব হিন্দু পরিবারকে দেওয়া হয় দাঙ্গায় যাদের ঘর বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল। এখন ওই ঘটনা পুরানো হয়ে গিয়েছে।

### ডেরাগাজীখাঁ

ভাষার বিচারে মুলতান, মজফ্ফরগড় এবং ডেরাগাজীখাঁ একই প্রদেশভুক্ত হলেও, ভৌগোলিকভাবে মজফ্ফরগড় এবং মুলতান সিন্ধুনদের পূর্বতীরে আর ডেরাগাজীখাঁ সিন্ধুর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। মজফ্ফরগড়কে মুলতানেরই কপি বলা যায়। শহর বাদ দিলে সর্বত্রই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। এখানেও মুলতানের মতো প্রচণ্ড শীত এবং প্রচণ্ড গরম। সিন্ধুর কিনারায় মাইলের পর মাইল ধরে শুধু বালির স্তূপ আর কাঁটা গাছের বোপ। অনেক জায়গায় উট চরছে। কাঁটা গাছ উটের প্রিয় খাদ্য। বাড়ি ঘরের অধিকাংশই কাঁচা, তাদের ছাদও কাঁচা। পুকুর বা ঝিল এ অঞ্চলের কোথাও দেখতে পাইনি।

সিন্ধুনদ আর সুলেমান পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এই জেলা প্রায় দুশো মাইল লম্বা এবং চওড়াও প্রায় ষাট মাইল। সিন্ধুর প্রবাহ এখানে খুবই অনিশ্চিত। সিন্ধুতীর থেকে দশ মাইল দূরে থাকা লোকজনও নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে না। পুরানো ডেরাগাজীখাঁ এক সুন্দর রমণীয় এবং সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। সিন্ধু হঠাৎ করে স্রোত পরিবর্তন করায় সেই শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন নতুন করে আবার ডেরাগাজীখাঁ শহরের পত্তন হয়েছে। বর্তমান শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের চেয়ে আরও দশ মাইল পশ্চিমে। শহর নতুন হবার ফলে তেমন কোনো বড় গাছপালা দেখা যায় না তাই গ্রীষ্মের দিনে এ শহরে ছায়ার অভাব বড় বেশি অনুভূত হয়। বাতাসে সিন্ধুর বালি উড়ে উড়ে এসে শহরের বাড়িঘরকে ঢেকে ফেলছে। যথেষ্ট গাছপালা থাকলে এই আক্রমণ অনেকটা রোধ করা যেত। এই শহরে হিন্দুরা বেশ বড় সংখ্যায় বাস করে। হিন্দু হাইস্কুল, আ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুল (আর্থসমাজী) এই দুইনামে হিন্দু ছাত্রদের জন্য দুটো স্কুল আছে। এর ওপর একটি সরকারি হাইস্কুলও আছে। অপরিষ্কার থাকা এবং অপরিচ্ছন্নতাবোধ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বোধ হয় পাঞ্জাবীদের সংস্কারে মিশে গেছে। যে সমস্ত বাড়ি ঘরকে বাইরে থেকে রংচঙে, বা যে-সব লোকজনকে পোশাকে-আশাকে বেশ সাফ সুতরো মনে হচ্ছে তাদেরই বাড়ির খোলা ছাদ পরিবারের সকলের পায়খানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শহরের গলিগুলোর হালও অনুরূপ। লোকের এ নিয়ে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। শহরের বেশিরভাগ উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, মোটর গাড়ির মালিক হিন্দু। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও হিন্দুদের সংখ্যা বেশি। আর্থিক অবস্থার নিরিখে হিন্দুরা অন্তত এই জেলাতে মুসলমানদের চেয়ে এগিয়ে আছে। পেশায় দিনমজুর, এমন হিন্দুর দেখা এখানে খুবই কম মেলে।



তবে এখানেও হিন্দুর সংখ্যাধিক্য শহরেই সীমাবদ্ধ। এতদিন ব্যাবসা বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়াভাবেই হিন্দুদের হাতে ছিল, তবে এখন মুসলমানরাও এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। পাঞ্জাবের নতুন কৃষি আইন পাশ হয়েছে। যার মোতাবেক যারা জারায়ত (চাষাবাস) পেশাভুক্ত নয় তারা আর কৃষি জমি কিনতে পারবে না। সরকারি আধিকারিকরা হচ্ছে করলেই যে কোনো লোককে (চাষি নয়) ঘোষণা করতে পারে এবং তার ফলে সে জমি কেনার অধিকার হারাবে। শহরের হিন্দুদের অধিকাংশই ব্যাবসাজীবী কাজেই অতি সহজে তাদের গৈরজারায়ত অ-চাষি ঘোষণা করে গ্রামে কৃষি জমি কিনতে বাধা দেওয়া হয়। এধরনের আইন সাদা চামড়ার লোকেরা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কেনিয়াতে ভারতীয়দের জন্য করেছে। তারই একটা নতুন সংস্করণ পাঞ্জাবের হিন্দুদের ওপরে চাপানো হয়েছে। এখন আবার তেজারতি কারবারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপের জন্য আইন পাস করার কথা ভাবা হচ্ছে। তেজারতি ব্যাবসা হিন্দুদের একচেটিয়া, তাদের এই অধিকার খর্ব করার জন্য আইনের অপব্যবহার চলছে। এখানে স্কুলে হিন্দু ছাত্রদের বেশি ফিস দিতে হয়। কারণ তাদের অভিভাবকেরা বিত্তশালী, অথচ তাদের জমি কেনার অধিকার নেই। স্বাধীনভাবে ব্যাবসা বাণিজ্য করার অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে। এভাবে সমগ্র হিন্দু সমাজের সঙ্গে এক কুৎসিত বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। আবার শহরে কোনো দাঙ্গা ফাঙ্গাসাদ হলে জরিমানার টাকাও হিন্দুদেরই গুনতে হয় বেশি। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যকার বিরোধও এই অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ি।

পাঞ্জাবের হিন্দুদের মধ্যে যে শিক্ষার প্রসার ঘটছে তার জন্য সবটুকু প্রশংসা আর্থ সমাজের পাওনা। তারাই স্কুল খুলে আলোচনা সভা ডেকে মানুষের চিন্তা ও সংস্কারে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। দানধ্যান ইত্যাদিতে লোকে এখন জাতীয় হিতের কথাও মনে রাখে। বিহারীদের মতো একটা বিয়ে কিংবা শাদিতে বেহিসেবি খরচ করে দেউলিয়া হয়ে যেতে এখানে দেখা যায় না। এর ফলে পুরোহিতদের আমদানির পরিমাণও কমে গিয়েছে। তবে এখানকার পুরোহিতরা বিহারী পুরোহিতদের চেয়েও নিকৃষ্ট। এরা নিজেদের সামান্য কিছু লাভের জন্য আর্থ সমাজীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে কসুর করছে না। এদের এখন প্রধান কাজই হলো কোনো সুযোগ পেলেই আর্থ সমাজীদের ওপরে বিবোধদগার করা। যদিও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাদের উদ্ধার কারণ বুঝতে পারেন, এবং যথারীতি পুরোহিতদের বিবোধদগার তাঁদের কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, কিন্তু এখনও এমন অনেক হিন্দু আছে যাদের ওপরে ওই পুরোহিতদের বেশ ভালোমতোই প্রভাব আছে, এবং হিন্দু সমাজকে আরও অধঃপাতে নিয়ে যাবার জন্য পুরোহিতরা সেই প্রভাবকে ব্যবহার করে। সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো এই যে এখানে যারা সনাতন হিন্দু সমাজের একচেটিয়া মালিকানা দাবি করছে সেইসব পুরোহিতরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে আচার আচরণ করে থাকে তা দেখলে বিহারের কোনো লোক এদের জল পিপাসা পেলেও নিজের জলের ঘটিটা এগিয়ে দেবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই পুরোহিতরা যথেষ্ট মাংস মুরগির ডিম খায়, জুতো পরে, রান্না করা খাবার এক জায়গা থেকে বিশ ক্রোশ পর্যন্ত দূরে অন্যের দ্বারা বহন করিয়ে নিয়ে গিয়ে খেতে তাদের সংস্কারে বাধে না। এখানকার বিয়ে-শাদিতে খাবার তৈরির ভার থাকে প্রধানত নাপিত নাপিতানীর ওপরে। কাহার সম্প্রদায় (পালকি-বাহক) এবং নাপিতেরাই এখানে রুটি তৈরি করে।

চাষাবাদ পেশা এমন ব্রাহ্মণেরাও বাড়িতে খচ্চর এবং গাধা পালন করে। এবং দরকার হলে তার ওপরে চড়ে। হাল চালানোর কথা না হয় বাদ দেওয়া গেলো কিন্তু মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দুপুরুষেরাও গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখা আরম্ভ করেছে। আবার দাড়িতে পাক ধরলে মেহেদীও লাগাচ্ছে। হিন্দু মেয়েরাও মুসলমান মেয়েদের মতো কানে একগাদা রূপোর গয়না পরে, পোশাকে সালোয়ার আর ঘাগরা ধরেছে। এখন বেশভূষা দেখে কে হিন্দু আর কে মুসলমান বলা খুব কঠিন। এই সনাতনীদেব চালচলন দেখে কোনো বিহারী সনাতন পন্থী লোক এদের হিন্দু বলেই মানতে চাইবে না, সনাতনী তো পরের কথা। তারা বলবে— তোমরা তো যা করছ তা আর্যসমাজীদের চেয়েও খারাপ। কিন্তু এই সনাতনী পুরোহিত সম্প্রদায় সময়ের প্রয়োজনকে বুঝতে চাইছে না। তারা হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টার বদলে বিভেদকেই জিইয়ে রাখার প্রাণপন চেষ্টা করে চলেছে। আসলে পুরোহিতরা ভাবছে, যদি আর্যসমাজীরা স্কুল, কলেজ, অনাখালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি খোলার জন্য জনতার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ না করত, তাহলে সেই অর্থ ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা তাদের দিত। সেই না পাওয়ার আক্রোশ থেকেই সনাতনীরা আর্য সমাজের বিরোধিতা করছে।

প্রদেশের নতুন আইনের ফলে সরাসরি চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন লোক গ্রামাঞ্চলে জমি জিরেতক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু এই আইন পাস হবার আগে থেকেই অনেক হিন্দুদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ কৃষি জমি থেকে গেছে। নিজেরা হালবলদ চালাতে পারে না বলে অধিকাংশ জায়গাতেই জমি মুসলমান চাষীদের কাছে রায়তি বন্দোবস্তে দেওয়া ছিল। জমিতে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ পাবে রায়ত আর একভাগ জমির মালিক। সরকারি খাজনা, কুয়ার মেরামতি, সেচের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, রায়তের থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি জমির মালিককেই করতে হয়। এই সব খরচ বাদ দিলে জমির মালিক ফসলের একতৃতীয়াংশেরও পুরোটা পায় না। তাছাড়া এক আধ বিঘা জমি রায়তদের এমনিই দিতে হয়, যাতে সে সবজি চাষ করে অথবা গাই বলদের জন্য ঘাস ফলায়। মজুর রেখে কাজ করাতে গেলেও মাসে দশ বারো টাকা লেগে যায়। উপরন্তু তাদের থাকার জায়গা, জ্বালানি কাঠের খরচ, বিনামূল্যে সবজি এবং ঋটির যোগান দিতে হয়। এই সমস্ত কাজের জন্য হিন্দুদের মুসলমানদের ওপরে নির্ভর করতেই হয়।

জেলায় দুটো অচ্ছুত সম্প্রদায় বাস করে। এদের সংখ্যা অনেক— প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার। আর্য সমাজীরা তাদের সমাজের মূল স্রোতে আনবার জন্য তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করছে। প্রাচীনপন্থীরা আর্য সমাজীদের সেই কাজে শুধু মৌখিক বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না সক্রিয় বাধার সৃষ্টিও করছে। জেলার অনেক হিন্দু মহাজনী ব্যবসা করে কিংবা দোকানে কাজ করে। হিন্দুদের মধ্যে ক্ষত্রী, দখিনি (রোডা ও অরোডা— দুই অচ্ছুত জাতি), উত্তরাধি (কায়স্থ), মোহিওয়াল (ভূমিহার ব্রাহ্মণ) এবং ব্রাহ্মণ, এই কটি বর্ণের লোকের সংখ্যাই বেশি। এদের বেশিরভাগই করালের কাজ করে। করাল বলতে এখানে দোকানদারদের বোঝায়। বড় বড় গ্রামেও দু-একজন করাল আছে, যাদের অস্তিত্ব সেখানকার নম্বরদারের মেজাজ মজির ওপর নির্ভরশীল। একজন হিন্দু ডাক্তার আমাকে একটা ঘটনার কথা বলছিলেন। সেখানকার মুসলমান নম্বরদার (তহসিলের সরকারি কর্মচারী) মহাশয়ের বাড়িতে কেউ অসুস্থ ছিল। নম্বরদার হিন্দু করাল বা দোকানদারের কাছে লোক পাঠিয়ে তক্ষুনি তাকে এক ঘটি জল ও মিষ্টি নিয়ে নম্বরদারের বাড়ি

যেতে বলে। দোকানে খরিদারের ভিড় থাকায় সে তৎক্ষণাৎ যেতে পারেনি। সেই অপরাধে নম্বরদার দোকানিকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এবং জুতোপেটা করে। দোকানদারের ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়, সে সবকিছুই নীরবে হজম করল অথচ নম্বরদারের কাছে তার দশ-পনেরো হাজার টাকা পাওনা ছিল।

কবর বা মাজার পূজো এখানে খুব ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমান স্ত্রীপুরুষেরা তো অংশ গ্রহণ করেই, কিন্তু হিন্দুরাও উৎসাহে তাদের চেয়ে কম যায় না। বৈশাখীতে (মেঘসংক্রান্তি) সখি-সখর পীরের মাজারে কয়েক হাজার হিন্দু স্ত্রীপুরুষ জড়ো হয়। কেউ সন্তান কামনায়, কেউ জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাবার আশায় সেখানে যায়। কয়েকশত মুসলমান পান্ডা (মুজাবর) সেখানে থাকে। ওই সমাবেশে হিন্দুদের বড়ই দুর্গতি সইতে হয়। জলের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় জল কিনে খেতে হয়। ভিস্তির মশকের উচ্ছিষ্ট জল পান করা পুরোহিতদের মতে সনাতন ধর্মেরই অঙ্গ। হিন্দুদের অনেকে এই মাজারে মুণ্ডন, উপবীত ধারণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানও করে।

### সীমান্ত ভ্রমণ

ভারতবর্ষে ‘সিন্ধু’ও ‘ব্রহ্মপুত্র’— এ দুটো সবচেয়ে বড় নদ। দুটোই তিব্বতে প্রায় পাশাপাশি উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। তবে তিব্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে হিমালয়ের দক্ষিণে নামার সময় ব্রহ্মপুত্র আসামের মতো অঞ্চল পেয়েছে, যেখানে বছরের কম বেশি কয়েকশো ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু সিন্ধু হিমালয় থেকে নিচে নামার সময় হাজারো জেলা থেকে আরম্ভ করে সিন্ধুপ্রদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত (যেখানে সিন্ধুনদ আরব সাগরে মিলিত হয়েছে) এমন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, যেখানে বছরে এক থেকে দেড় ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হঠাৎই কোনো বছরে হয়। এখানে বৃষ্টি এতই কম যে তা কাঁচা মাটির ছাদ ভেদ করে ঘরের মেঝেকে ভেজাতে পারে না। গ্রামের দিকে অধিকাংশ বাড়িই খড় বা শণের ছাউনি দেওয়া অথবা ছাদে কাঁচামাটির আস্তরণ দেওয়া।

মুলতান থেকে মজফ্ফরগড়, ডেরাগাজীখা থেকে ডেরাইসমাইলখা পর্যন্ত, দু-দিকে শুধু বালুকাময় ভূমি চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে ঝাউ গাছের মতো দেখতে ফরাশ গাছের ঝোপ অথবা বাবলা গাছের কাঁটা ঝাড়। এই প্রথম মরুভূমি অঞ্চলে প্রচুর উটকে খোলা অবস্থায় চরতে দেখলাম। কাঁটা গাছ উটের প্রিয় খাদ্য এবং এখানে তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যদিও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এসব অঞ্চলে খুবই সামান্য তবুও সিন্ধুর অনুগ্রহে দশ বারো হাত মাটি খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। অনেক এলাকায় বছরের ছ-মাস অর্থাৎ সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকালে খালের জলে সেচের কাজ হয়। এখানে কুয়োতে রহট নামের একটা ঘটিযন্ত্র বসানো থাকে। কলুর বলদের মতো একজোড়া বলদকে ওই যন্ত্রের সঙ্গে লম্বাডড়ি বেঁধে জুতে দেওয়া হয়। বলদ যতদূর পর্যন্ত ডড়ি যায় ততদূর পর্যন্ত চলে এবং সেই ডড়ির টানে ঘটি বসানো গোল চাকা কুয়োর ভেতরে আস্তে আস্তে চক্রাকারে ঘোরে এবং ঘটি ভর্তি হয়ে জল উঠে আসে। আবার চক্রের নিয়মেই ঘটি উন্টো হয়ে যায় এবং সব জল পড়ে যায়। এইভাবে জলতোলা আর ফেলা চলতে থাকে। কুয়োর কাছ থেকে নালা কেটে খেতের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে ঘটির জল পড়ে ওই নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খেতের ভেতরে পৌঁছায়। বলদ তাড়নার জন্য একজন লোককে কুয়োর পাড়ে

সারাদিন বসিয়ে রাখা হয়। তার বসার জন্য ঘর বা শগের ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী একটা চালা করা থাকে। কুয়ো প্রায় সারা দিনরাত সক্রিয় থাকে। এইভাবেই প্রতিটি কুয়োর পাশের কয়েক বিঘা জমি শ্যামল সবুজ হয়ে 'কে'।

একশো মাইল প্রশস্ত হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সমুদ্র তট পর্যন্ত ছাড়ানো সিঙ্কুনদের দু-পাশের ভূভাগ এক বিচিত্র দেশ। কোনো এক সময় এই অঞ্চলই ছিল আর্য সভ্যতার দুর্গ। ঋষিরা এই সিঙ্কুর তীরে বসেই যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করতেন, সাম (বেদ) গাইতেন।

কিন্তু কালচক্রের গতি অত্যন্ত-প্রবল। যদিও আজ পর্যন্ত এই সিঙ্কু অঞ্চলে সেই আর্যদের উত্তর পুরুষেরাই বাস করছে কিন্তু তারা এমন এক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে যার জন্য তারা তাদের পূর্বজকে অস্বীকার করে। তাদের কাছে আর্য সভ্যতা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জিনিসই ঘৃণ্য। এরা স্বপ্নেও ভাবে না যে এদের পূর্ব পুরুষেরা এমন এক সভ্যতার সম্পদে গরীয়ান ছিলেন, এক চিরকালীন সাহিত্যের স্রষ্টা ছিলেন, যার প্রতি নিরপেক্ষ সমালোচকরাও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগুলোর কথা যদি আমরা ধরি, যাদের পূর্বজরা প্রকৃত পক্ষেই আরণ্যক জীবন যাপন করত কিন্তু আজকের ইউরোপীয়রা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেই অতীত জীবনকে অস্বীকার করে না। তবে কি ধর্ম পরিবর্তনের ফলে ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনে এমন কিছু সৌভাগ্য এনে দিয়েছে যা তাদের অতীতকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে? এ কথা তো স্পষ্ট, যদি কেউ আজ ফা-হিয়ান কিংবা হিউ-এন-সাঙের ভ্রমণের দিনলিপি পড়ে, তাহলে এই অঞ্চলের গৌরবময় ইতিহাস আরেকবার তাদের স্মরণ হবে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চলে যারা বাস করত, তারা ছিল শাস্ত্র, সভা এবং কোমল হৃদয়। তাদের ছিল সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যানুরাগ এবং শিল্পকলার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ। সে জায়গায় তাদের উত্তর পুরুষেরা ক্রুর, কপট, মিথ্যাচারী, মূর্খ এবং সমস্ত রকমের দুর্ব্যসনে আসক্ত। ইসলাম অহংকার করে যে, তারা মূর্তিপূজার মতো বুদ্ধিহীন, পাপময় প্রথার শিকড় পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে পেরেছে, কিন্তু এতদঞ্চলের হালহাক্কত দেখলে মনে হবে অন্তত এখানে ইসলাম তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এখানকার মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে এখনও মূর্তিপূজার চল আছে। হিন্দুদের মূর্তির সঙ্গে তাদের মূর্তির তফাত শুধুই আকৃতিগত। তবে হিন্দুদের মূর্তির মধ্যে শিল্পকলা, রুচির পরিচয় থাকে এবং বেশিরভাগ মূর্তি তৈরি হয় মানুষ অথবা পশুর আদলে, সেখানে মুসলমানদের মূর্তিগুলো চারকোণা, স্তূপাকৃতির তিন-চার হাত লম্বা শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গতিহীন বেটপ এক বস্তু। এই সব মূর্তির ওপরে আবার কাপড় ও মিঠাই ছড়ানো থাকে। এই মূর্তির কাছে তারা সন্তান কামনা করে প্রার্থনা জানায় ধনসম্পদ প্রাপ্তির আশা করে। কেউ কেউ আবার এখানে মুগুনও করে। কাশী গয়ার মতো এখানেও কয়েকশো মুজাব্বর (পান্ডা), হিন্দু পান্ডাদের মতোই খাতা বই সহ কয়েক পুরুষের হিসাব নিয়ে বসে থাকে। যজ্ঞমানের দখল নিয়ে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়িও হয়। উটের দুপাশে ঝুলতে ঝুলতে যাত্রীরা দূর দূরান্ত থেকে তীর্থ করতে এখানে আশে। এইসব তীর্থ যাত্রীদের গলায় বিষ্ণেশ্বরী দেবীর ভক্তদের মতো সবুজ কাপড় বাঁধা। এই সব মুসলমানী তীর্থে হিন্দুরাও উদারতার সঙ্গে যোগ দেয়। তারা এখানে উপবীত ধারণ, মুগুন ইত্যাদি সংস্কার জাতীয় অনুষ্ঠান করে।

এদিকে রেলের ভ্রমণ করার সময় প্রায়শই পুলিশ এসে আপনাকে বলবে — সাবধান, জার্নিসপত্র চুরি যেতে পারে। নুলাতানের কাছে মামুদকোট থেকে রেললাইন সিঙ্কু নদের সঙ্গ নেয়

এক সঙ্গ চলতেই থাকে যতক্ষণ না অটকে এসে সিঙ্কুর ওপরে ব্রীজ পার হয়ে ওপারে যায়। মিঞাবালি স্টেশন থেকে দক্ষিণে সিঙ্কুর পশ্চিম তটে, দিকচক্রবালে কালো মেঘের মতো এক সারি পাহাড় আবছা দেখা যায়। মিঞাবালি স্টেশন ছাড়ালে পূর্বদিকেও পাহাড় চোখে পড়ে। এই শহরে সামান্য সংখ্যায় হিন্দু বাস করে এবং তাদের বেশিরভাগই তেজারতি কারবারের সঙ্গে যুক্ত। এদের চাল চলন, হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় যে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এরা খুবই ভয়ে ভয়ে থাকে কারণ এদের প্রায় সকলেরই আর্থিক অবস্থা ভালো।

পোশোয়ার শহরের জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ। তার মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা মাত্র ন-হাজার। কাগজে কলমে হয়তো এটা ইংরেজদের রাজত্ব কিন্তু এখানকার হিন্দু অধিবাসীদের কাছে এটা মুসলমান রাজত্ব। প্রাদেশিক বিধান সভায় সংস্কার সম্বন্ধীয় আইন পাস হবার পর বহু মুসলমানকে বলতে শোনা গেছে যে এবার হিন্দুদের লটবহর নিয়ে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

অটকে সিঙ্কুরদ পার হয়ে রেল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ঢোকে। এখানে চতুর্দিকে বৃক্ষ বনস্পতিহীন নগ্ন পাহাড়ের মেলা। অনেকগুলো সুবন্দ পথ পার হয়ে রেল পেশোয়ার উপত্যকায় পৌঁছায়। শীতকালে এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তখন বাড়ির ছাদে কোনো পাত্রে জল রেখে দিলে সকালে দেখা যায় যে সেটা বরফ হয়ে গেছে। পেশোয়ার শহরের মাটির রং প্রধানত লাল। জায়গায় জায়গায় প্রবাহিত খাল আছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এখানকার ফসল ভরা খেত দেখতে ঠিক তেমনই লাগল যেমন লাগে বিহারে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়ির দেওয়াল কাঁচা মাটির, ছাদও মাটির। গ্রামে এক আধ খানা পাকা বাড়িও দেখা যায় তবে সেগুলো প্রধানত ব্যবহৃত হয় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। দেশের অন্য জায়গার মতো এখানেও অস্ত্র আইন লাগু আছে, কিন্তু সেই আইনকে বৃদ্ধাস্পৃষ্ট দেখিয়ে এখানে অবাধে অস্ত্রের ব্যবহার চলে। এখানে প্রায় প্রত্যেকের কাছেই বন্দুক আছে, এবং বন্দুক চিরকাল নিষ্ক্রিয় থাকে না, কখনও না কখনও তার ব্যবহার করতেই হয়।

পেশোয়ারের মাটি বেশ উর্বর বলেই মনে হয়। বাগান করার দিকে লোকের বেশ ঝোঁক আছে। নানা ধরনের আঙুর, ডালিম, নাসপাতি, কমলা, খোবানি, বাদাম ইত্যাদির লতা গুল্ম, বৃক্ষে বাগান সাজানো। পেশোয়ারের আখ খুব বিখ্যাত। সাধারণভাবে দিল্লী শহরের পশ্চিম থেকে আখের এলাকা আরম্ভ। পাঞ্জাবের সমস্ত শহরেই আখ বিক্রি হতে দেখা যায়, যেমন ভারতের পূর্ব প্রান্তে দেখা যায় পানের দোকান। রাস্তায় চলতে চলতেও আখের টুকরো চোষার রেওয়াজ স্ত্রী পুরুষ সকলের মধ্যেই আছে। পেশোয়ারে ফসল কাটার সময়েই, বেশ কিছু আখ মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয় তাম্বুলি পানের মতো।

পেশোয়ার রেল স্টেশন থেকে শহর বেশ দূরে। স্টেশনে নামতেই পিছনে পুলিশের লোক লেগে যায়। পুরো ঠিকুজি কোষ্ঠী না জেনে রেহাই দেয় না। এর দ্বারা ই যাত্রীরা বুঝতে পারে যে তারা এক বিশেষ মূল্যকে এসেছে। রাত্রিতে স্টেশন থেকে শহরে যাওয়া বেশ ভয়ের ব্যাপার। রাত্রিকালীন যাত্রীরা পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট শহরে নামে। বহুবার টাঙার ঘোড়াকে গুলি চাליয়ে জখম করে কিংবা মেরে ফেলে সওয়ারীদের সর্বস্ব লুট হয়েছে। কখনও কখনও সওয়ারীদের গুলি লুটপাট করেই রেহাই দেয়নি ধরে নিয়ে গেছে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য। শহরে প্রবেশের মুখে

দরওয়াজা আছে যা রাত্রিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরওয়াজায় শসস্ত্র পুলিশের প্রহরা থাকে। কোথাও কোথাও পুলিশের চৌকিতে অ্যাম্বুলেন্সও থাকে। এখানকার পুলিশের উর্দি পাঞ্জাবের পুলিশের মতো। শহরে আসার রাস্তার দুধারে কাঁটা তারের বেড়া, মাঝে মাঝে কাঁটা তারের গেট, যা দিয়ে এপাশের লোক ওপাশে যাওয়াত করে। কাঁটা তারের বেড়াও এক সারিতে নয় দু-সারিতে। দু-সারি কাঁটা তারের বেড়ার কোথাও কোথাও আবার একটু ফাঁক রাখা আছে। যেখানে লাফ দিয়ে কাঁটা তারের বেড়া পার হওয়া যায়। এটার কি উপযোগিতা? এটা কি লুটেরা পাঠানদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য নাকি লুটপাট করে তাদের নির্বিঘ্নে চলে যেতে দেবার জন্য?

পেশোয়ার শহরের বড় বড় ব্যবসায়ী, সাহুকার, ঠিকাদার সবই হিন্দু সম্প্রদায়ের। কিছু হিন্দু অফিস কাছারিতে কাজ করে। সনাতন ধর্ম স্কুল এবং ন্যাশনল (আর্য) স্কুল ছাড়া আরও তিন চারটি স্কুল আছে। লেখাপড়া শেখার আগ্রহ কিন্তু শহরবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

### কোহাট

পেশোয়ার থেকে কোহাট শহরের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল। দিনের বেলা লরি ও মোটর গাড়ি এই দুই শহরের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করে। পেশোয়ার থেকে দশ বারো মাইল বাইরে গেলেই ফসলের মধ্যে আর সেই সবুজ সতেজ ভাব দেখতে পাওয়া যায় না। রাজপথে জায়গায় জায়গায় পুলিশের চৌকি রয়েছে। রাস্তা খুব ভালো। মাঝে মধ্যে অনেক গ্রাম পড়ে। এখানকার মানুষের গায়ের রং ফর্সা এবং শরীর বেশ হুস্তপুষ্ট মজবুত। তবে তাদের বেশভূষা অপরিচ্ছন্ন এবং বহু ব্যবহারে জীর্ণ। পাঠান মেয়েরা রংচঙে পোশাক পড়তে ভালোবাসে। এদের মধ্যে বোরখার চলন বেশি নেই। এদের মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের ঘাগরা ধরনের কুর্তা এবং পাজামা পরে, মাথায় ওড়না ব্যবহার করে। স্নানের মতোই এরা মাথার চুলও বহুরে একবারই পরিষ্কার করে। এদের গ্রামগুলিতে গাধা, মুরগি এবং কুকুর চরতে দেখা যায়।

### নো ম্যানস ল্যান্ড

পেশোয়ার থেকে উনিশ কুড়ি মাইল গেলেই দেশের অন্তিম সীমান্ত চৌকি পাওয়া যায়। সেখানে একটা সাইনবোর্ড টাঙানো আছে। তাতে লেখা— ‘Tribal Territory, go carefully’। এখান থেকেই সীমান্তের উপজাতি এলাকা আরম্ভ। সড়ক উঁচু নিচু এবং কয়েকটা নালা পার হয়ে এগিয়েছে। খেতের অবস্থা—যেখানে পেশোয়ারে এখন গমের গাছ কোমর পর্যন্ত, কোথাও বা কোমর ছাড়িয়ে বুক পর্যন্ত সেখানে এখানকার গম গাছ এখন বিঘ্ন খানেক দীর্ঘ এবং দূরে দূরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রোয়া। এক বিঘা জমিতে বহুক্ষেত্রে একমণ ফসল হয়। অথচ এখানকার জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এক মাইলের মধ্যে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম পড়ল। এই অঞ্চলে ঢুকলেই, কেউ কিছু না বলে দিলেও এমনিতেই বোঝা যায় যে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের বাইরে কোথাও এসেছি। প্রত্যেক গ্রামেই রাস্তার ধারে জনা পঁচিশেক পাঠান কাঁধে কিংবা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে বসে বসে আড্ডা মারছে, এমন দৃশ্য দেখা যাবে। নিজের চাষের জমি দেখতে যাবার সময়ও পাঠান পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে নেয়। বন্দুকের আধিক্য এখানে এত বেশি যে কোনো লাঠিপ্রধান এলাকাতেও এত লাঠি দেখা যায় না। রাস্তার ধারে একটা বন্দুকের কারখানাও দেখলাম। আমি

আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা এরা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বন্দুককে এত প্রয়োজনীয় মনে করে কেন? সব সময় এরা বন্দুক নিয়ে ঘোরে! তিনি বললেন—‘এদের নিজেদের মধ্যে এত শত্রুত্ব যে কেউ নিজেকে সুরক্ষিত মনে করতে পারে না। দেখছেন না প্রতিটি গ্রামই তৈরি হয়েছে কেল্লার ধাঁচে। চারদিকে প্রাচীর এবং প্রাচীরের গায়ে মজবুত দরওয়াজা। প্রাচীরের গায়ে জায়গায় জায়গায় ছিদ্র যাতে প্রয়োজন হলে ওই পথে গুলি চালানো যেতে পারে।’ এই উপজাতিদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ লেগেই আছে। এজন্য প্রাণের দায়ে সকলেই বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করে। লুটপাট করাটা এদের অধিকারের মধ্যে পড়ে, এরকম একটা ধারণা এদের মধ্যে রয়েছে। এদের ধর্মীয় উগ্রতা, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, এগুলোকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রেখে, জীবিকার্জনের অন্য সাধনগুলোর দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে এখানে এক বিঘা জমিতে প্রচুর পরিশ্রম করলে তবে কোনো মতে একমণ ফসল হয়। লুটতরাজের মাধ্যমে নিখরচায় পাওয়া জিনিসপত্র ভোগে এরা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে আর শ্রমসাধ্য কাজ করতে মন বসে না।

নো ম্যানস ল্যান্ডের শেষে রাস্তা পাহাড়ের ওপরে সাপের মতো ঐক্যে গিয়েছে। এই পাহাড় থেকে নামলেই কোহাট শহর। কোহাটের পশ্চিম ও উত্তরে কয়েকটি ন্যাড়া পাহাড় আছে। কোহাটের রেল স্টেশন এবং সামরিক ছাউনি আছে। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। হিন্দু জনসংখ্যা হাজার চারেকের মতো। শহরে ঢোকার জন্য গেট বা দরওয়াজা আছে। তার কাছে জলের কল বসানো আছে। প্রধান বাজারের অধিকাংশ দোকানদারই হিন্দু। কয়েকবছর আগে এখানেও ধর্মীয় দাঙ্গা হয়ে গেছে এবং তারপর থেকে হিন্দুদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য কমে আসছে। সেদিন যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবলীলা এই শহরে চলেছিল, তার বীভৎসতার কথা আজও হিন্দু জনসাধারণ ভুলতে পারেনি। তারা ওটাকে মনে করে গত কালের ঘটনা। শহরের গন্ডুম-মন্ডির চারপাশের মহল্লা এবং হিন্দু-কারবারিদের মহল্লার অধিকাংশ বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। দক্ষ, অর্ধ দক্ষ কালো চেহারা নিয়ে বাড়িগুলো আজও আছে এবং সেদিনের তাণ্ডবলীলার সাক্ষী দিচ্ছে। ঠিক এরকম দৃশ্যই দেখেছি মূলতানে। পোড়া বাড়ির মালিকদের এত পয়সা নেই যে বাড়িকে নতুন করে তৈরি করে, আর করবেই বা কোন্ ভরসায়। আপৎকালীন ঋণ হিসাবে সরকার থেকে কিছু অর্থ পেয়েছিল যা পেটে খেতেই চলে গিয়েছে। এখানকার হিন্দুরা কাপড়, সবজি, মিষ্টি, মণিহারি ও কাঠের আসবাব পত্রের ব্যবসাতেই নিয়োজিত ছিল। দু-বছর আগে যে হিন্দু ব্যবসায়ী লক্ষ টাকার লেনদেন করত, সে আজ এক টাকার জন্য অন্যের কৃপা-নির্ভর। পরপর অনেকগুলো পোড়া বাড়ি দেখে জঙ্গলে দাবানলে পুড়ে যাওয়া গাছের কথা মনে হচ্ছিল। আসলে এই সব বাড়ি তৈরি এবং সাজানোতে এত কাঠের ব্যবহার হয়েছে যে আগুনের পক্ষে ধ্বংসের কাজটা খুব সহজসাধ্য হয়েছে। বড় বড় বাড়িতে কড়ি বরগা, দরজা, জানালা, দেয়াল সর্বত্রই কাঠের ব্যবহার হয়। শহরের হিন্দুরা এখন মুসলমানদের অনুকম্পার ওপরে নির্ভর করে টিকে আছে। পেশোয়ার শহরে দেখেছি যে মুসলমান টাঙাওয়ালারা সাধারণভাবে হিন্দুদের ‘হিন্দু কাফের’ বলে সম্বোধন করে।

পেশোয়ার থেকে একটা রেল লাইন খাইবার গিরিপথ পার হয়ে কাবুলের সীমানায় লভীখানা পর্যন্ত গিয়েছে। তবে এখনও রেলগাড়ি ওই পর্যন্ত যাচ্ছে না, লভীখানার কিছু আগে লভীকোটল বলে স্ট্রায়েকটি রেল স্টেশন আছে, ট্রেনের যাত্রা এখন সেখানেই শেষ হচ্ছে। পেশোয়ার

ক্যান্টনমেন্টের পরের স্টেশন হলো ইসলামিয়া কলেজ। ইসলামি শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। শহরের লোকবসতি থেকে অনেক দূরে এই কলেজের অবস্থান। কলেজের এবং তার ছাত্রাবাসের ইমারত দেখতে খুব সুন্দর লাগে। ইসলামিয়া কলেজের পরের রেল স্টেশনের নাম জমরুদ।

জমরুদে সেনা ছাউনি এবং রাজা হরি সিং নলবার কেন্দ্র আছে। রাজা হরি সিং ছিলেন মহারাজ রণজিৎ সিংহের সেনাপতি। সীমান্ত অঞ্চলের পাঠানরা এত দুঃসাহসী ও বেপরোয়া যে ইংরেজ সরকারও তাদের প্রাধান্য মেনে চলে। সেই পাঠানেরাও হরি সিং নলবাকে কিরকম ভয় পেত তা পাঠান মায়ীদের একটি কথায় স্পষ্ট হয়। তারা বাচ্চাদের চুষ করানোর জন্য বলত — ‘চুষশো হরিয়া বাগাল’ (চুষ কর, হরিয়া আসছে)। এটা সত্য যে শিখদের শাসনকালে পাঠানরা যতটা শান্ত প্রকৃতির জীবনযাপন করত, এখন তা করে না। বৃটিশ সরকারের নীতি হচ্ছে কোনো মতে তাদের কিছু ঘুষঘাস দিয়ে আপাত শান্ত রাখা, আর এই নীতির ফলে পাঠানরা আরও বেপরোয়া হবার উৎসাহ পাচ্ছে। এক অভিজ্ঞ সরকারি কর্মচারী বলছিলেন যে কিভাবে এক পাঠান খান (পাঠান সর্দার) একদিকে সরকারি অফিসারদের কাছে তার আনুগত্য দেখায় আবার তখনই পাহাড়ের আড়ালে কয়েকশো সশস্ত্র পাঠানের জমায়েত ঘটিয়ে দেয়। তারপর সরকারি অফিসার কে বলে — ‘দ্যাখো সাহেব, ওখানে ক্ষুধার্ত পাঠানেরা জমা হয়েছে, এরপর তারা হাঙ্গামা হুজ্জাত, লুটপাট করতে পারে। তখন তারা আর আমার কোনো কথা শুনবে না।’ সাহেবও অনেক অনুনয় বিনয় করে জমায়েতকে ফিরে যেতে রাজি করায় পরিবর্তে তাদের কিছু অর্থ খয়রাতি সাহায্য রূপে দেয়। খয়রাতি সাহায্যের অর্ধেক টাকা খান নিজে পকেটস্থ করে বাকি টাকা দশ,কুড়ি হিসাবে মেজ, সেজ সর্দারদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেয়। পাঠান পুরুষেরা শিকার আর লুটপাট করতেই ভালোবাসে। পাঠানেরা কাঁধে অথবা পিঠে বন্দুক এবং গলায় কার্তুজের মালা ঝুলিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ঘরের এবং বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম তাদের মেয়েরাই করে। তারাই চাষের খেতে কাজ করে, কাঠ কেটে আনে, জল ভরে, গৃহপালিত পশুদের জন্য চারা, ঘাস সংগ্রহ করে। জমরুদ রেল স্টেশন থেকে একটু এগোলেই পাহাড়ের আরম্ভ এবং সেই সঙ্গে খাইবার গিরিপথও। কোনো পাহাড়েই কোনো সবুজের চিহ্ন নেই, শুধু দু-একটা কাঁটা গাছের ঝাড় দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের পাথরখণ্ডও খুব বড় বড় নয়। পেশোয়ার থেকে লডীখানা এই তিরিশ মাইল খাইবার রেলপথ স্থাপনের জন্য গভর্নমেন্ট সাড়ে চারশো কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ঠিকাদারির কাজও পাঠানদেরকেই দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক পাঠান মজুর রোজ একটাকা হিসাবে মজুরি পেত। নানাভাবে পাঠানদের তোষণ করে, প্রলোভন দেখিয়ে, এই ছোট রেললাইনের কাজ শেষ হয়। জায়গায় জায়গায় রেললাইনকে পাহাড়ের মধ্যে সুরঙ্গ কেটে আগে নিয়ে যেতে হয়েছে। কোথাও আবার পাহাড়ের গা বেয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে তার শীর্ষদেশে পৌঁছেছে, আবার সেভাবেই নিচে নেমেছে। পথে, খাইবারের মধ্যে একটা হলুদ রঙের মসজিদ আছে তাকে লোকে অলামসজিদ বলে। মুসলমানদের মধ্যে কিংবদন্তি আছে যে খাইবার জয় করে পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদের ভ্রাতা হজরত আলি এখানে নামাজ পাঠ করেছিলেন। এই পাহাড়ি পথে জায়গায় জায়গায় সেনা চৌকি আছে। লডীকোটলের সেনা চৌকিতে গোখা, রাজপুত, পাঞ্জাবী এবং গোরী সৈন্য আছে। লডীকোটল নতুন বসতি তবে শহরে জল, কল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। এই তিরিশ মাইল রেলপথের সবটুকুই পাহাড় নয়, মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত সমতল



ভূমিও পড়ে। কাবুলের সীমানা এখান থেকে মাত্র চার-পাঁচ মাইল। তবে এখানকার অবস্থা দেখে মনে হয় ভবিষ্যতে এখানে সেনা চৌকির বদলে পুরোদস্তুর সামারিক ছাউনি গড়ে উঠবে। সেনা চৌকির চারধারে কাঁটা তারের দু-সারি বেড়া। এবং তার মধ্যে কাঁটাতারেরই গেট। প্রত্যেক রাস্তাতেও কাঁটাতারের অবরোধ আছে। রাত্রিতে সমস্ত গেট ও প্রধান দরওয়াজা বন্ধ থাকে। এ সবই করা হয়েছে উপদ্রবী পাঠানদের ভয়ে। লডীকোটল চারদিক পাহাড়ে ঘেরা এক সমতল ভূমি। চারদিকের পাহাড়েই ফৌজি সতর্কতা বজায় আছে। লডীকোটলে প্রথম দিকে ছোট মতো একটা কেল্লা ছিল। কিন্তু বিগত যুদ্ধের পর এখানে সেনা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে রেললাইন আরও অগ্রসর হয়ে লডীখানা পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু লডীকোটল লডীখানার মধ্যে সুরঙ্গ পথে ধ্বস নামায় ওই পর্যন্ত ট্রেন এখন যাচ্ছে না।

লডীকোটলের চার-পাঁচ মাইল আগে রাস্তার ধারে ছোট একটা পাহাড়ের ওপরে বৌদ্ধস্তূপ আছে। কোনো এক সময়ে এই ছায়াগা— যাকে এখন দূর থেকে দেখলে নিছকই একটা ইটের স্তূপ মনে হয়— হাজার হাজার তীর্থ যাত্রীর পুণ্য স্থান ছিল। হয়তো খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে চিনা পর্যটক ফা-হিয়ান কিংবা হিউ-এন-সাঙ এখানে বিশ্রাম নিয়েছেন। সে সময় এই স্তূপের কাছাকাছি অবশ্যই কোনো সংঘারাম (বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অতিথিশালা) ছিল। যেখানে অনেক জ্ঞানী, গুণী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আসতেন। তাঁরা অহিনিশি তাঁদের চতুর্দিকে ‘অহিংসা’, ‘প্রেম’, ‘জীবে দয়া’ ইত্যাদি মন্ত্র সূর্য কিরণের মতোই চারদিকে ছড়িয়ে দিতেন। যাঁরা একদা ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, আজ তাঁদেরই উত্তরসূরীরা মূর্খতা আর নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়েছে। শহরের আশেপাশে বেশ কিছু গ্রাম আছে এবং সেখানে গমের খেত দেখা গেলো। গ্রামের মধ্যে কোনো আলাদা আলাদা বাড়ি দেখতে পেলাম না। সবাই এক চারদেয়ালে ঘেরা বড় জায়গায় ঘরের মধ্যে থাকে। এই চার দেয়ালের মধ্যে নানা জায়গায় ফুটো আছে যেখান থেকে বন্দুক ছোঁড়া যেতে পারে। প্রত্যেক গ্রামেই একটা দুটো গোল মিনার আছে যার সবটাই অস্থায়ীভাবে তৈরি। মিনারগুলো দলবদ্ধ শত্রুর আক্রমণের মুখে প্রতিরোধের উদ্দেশে বানানো হয়েছে। মিনারের ওপর থেকে বন্দুক চালিয়ে অনেক দূরের শত্রুকেও ঘায়েল করা যায়।

আগেই বলেছি যে পাঠানরা সর্বদাই গোষ্ঠী লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকে। যখন নিজেদের মধ্যে মারামারির কাজ থাকে না, তখন অন্যত্র গিয়ে লুটপাট চলায়, দু-এক জনকে ধরে নিয়ে যায়। ধৃতদের হাতের পাঞ্জার ওপরে চারপাই চাপিয়ে ঘুমোয়। নখে সূচ ঢোকায়, প্রচণ্ড ঠান্ডার দিনে রাত্রিতে ঠান্ডা জলের মধ্যে রাখে। এভাবে যত রকম আসুরিক শারীরিক নির্যাতন চালানো যায় চালায়, তারপর ধৃতের আত্মীয় স্বজনদের নাম ঠিকানা জেনে মুক্তিপণের চিঠি পাঠায়— এত টাকা আমাদের দিলে তোমার আত্মীয়কে ছাড়া হবে অন্যথায়....। সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজ শাসিত এবং ইংরেজ শাসনের বাইরে, এই উভয় অঞ্চলের পাঠানরাই প্রকৃতপক্ষে অর্ধদস্যুর জীবনযাপন করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুরাই এদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়। এখন থেকে বছর দশেক আগের ঘটনা, এক বিভ্রাট হিন্দু ব্যবসায়ী পেশোয়ার শহরে থাকতেন। তাঁর বাড়ির সামনে একদিন ঘোড়া আর খচ্চর চেপে অনেক লোক এল। জানা গেলো তারা শহরে কোনো বিয়ে বাড়ির বরযাত্রী হিসেবে এসেছে। সন্দের পরই সেই ব্যবসায়ীর বাড়ির সদর দরজা ভাঙার চেষ্টা শুরু হলো। দরজা অত্যন্ত মজবুত থাকায় সেটা ভাঙতে পারল না। তখন লুটেরারা মই লাগিয়ে বাড়ির

ওপরে উঠল। ওই বাড়ির পাশেই ব্যবসায়ীর আরেকটি বাড়ি ছিল। বাড়ির মালিক তাঁর ব্যবসার খাতাপত্র নিয়ে ছাদটপকে পাশের বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়ির কাছে গলির মধ্যেও ডাকাতদের পাহারা ছিল। বেশ খানিকক্ষণ বিনা বাধায় লুটতরাজ চালিয়ে, লুটের মালপত্র খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তারা চলে গেলো। পাঠানদের চাষবাসে মন নেই। যেটুকু হয় তাও পাঠান মেয়েদের পরিশ্রমে। বেশিরভাগ পাঠানই লুটতরাজ, সরকারি খয়বাতি (যেটা সরকার ভয় পেয়ে দিয়ে থাকে) ইত্যাদিতে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। যখন খাইবার রেলওয়ে তৈরি হচ্ছিল তখন সেখানে মজুর হিসেবে কাজ করে পাঠানেরা দিনে একটাকা করে মজুরি পেত। সে সময় নাকি এধরনের লুটতরাজের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। আমি একজনকে বললাম— রেললাইন পাতার মোট খরচ সাড়ে চার কোটি টাকার দু-কোটি নিশ্চয়ই এই পাঠানদের কাছে গিয়েছিল এবং সেই টাকাতে এরা বেশ কিছুদিন সুখে কাল কাটিয়েছে? সে বলল— ‘অধিকাংশ টাকাই বড়লোকদের পেটে গিয়েছে, কারণ ঠিকাদারির কাজ তারাই বাগিয়েছিল। কিন্তু টাকা কি এমনি এমনি কারও কাছে বেশিদিন থাকে? ওরা তো সেই টাকাকে কোনো ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করেনি যে টাকা বাড়বে। অধিকাংশ টাকাই ফালতু খরচ করে উড়িয়েছে। দেখছেন না এখানে এখন কিরকম মোটর গাড়ি উড়ছে, সবই ওই রেললাইনের পয়সায়। তাছাড়া রোজই প্রায় খাবার নিমন্ত্রণ আসছে যাচ্ছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আবার যে কে সেই হয়ে যাবে। ফের শুরু হবে মার দাস্তা, লুটপাট।’

আশ্বের দিন জমকদের কাছে দুই গোষ্ঠীর লড়াই বেধে গেলো। দুপক্ষই কোনো কিছুর আড়াল নিয়ে পরস্পরের দিকে গুলি চালাতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে চলল সেই গুলি বিনিময়। কাছেই একটা সরকারি চৌকি ছিল, দুদলের গুলির লড়াইয়ের জের সেখানেও পৌঁছাল। দু-একজন সিপাহীর হাত পা জখম হলো। এবার গভর্নমেন্ট দুপক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা করানর উদ্যোগ নিল। অবশেষে পাঠানদের প্রথানুসারে এক মোল্লা এসে উভয় পক্ষের মাঝখানে একটা পাথর এনে সাত বছরের জন্য রাখল। অর্থাৎ সাত বছরের জন্য সন্ধি হয়ে গেলো। অষ্টম বছরে আবার যুযুধান দুপক্ষ গুলিযুদ্ধ শুরু করতে পারে।

লন্ডীকোটল থেকে চার মাইল এগিয়ে লন্ডীখানার কাছে ‘কাফের কোট’ নামে একটা জায়গা আছে। জায়গাটার অবস্থান একটা পাহাড়ের ওপরে। ওখানে বৌদ্ধ যুগের পাথর কেটে তৈরি করা মনোহর শিল্প সৃষ্টির ধ্বংসাবশেষ আছে। এই পবিত্র জায়গা যা একদিন হাজার হাজার ভ্রমণার্থী ও তীর্থযাত্রীদের কাছে শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থান ছিল, তাকে আজ তাদেরই পরবর্তী বংশধরেরা ‘কাফের কোট’ এর মতো একটা ঘৃণ্য নাম দিয়ে মনে রাখছে। কিন্তু এই নাম যারা দিয়েছে সেই উত্তরপুরুষেরা কি তাদের পূর্বজদের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে? ইসলাম এদের মধ্য থেকে বৃতপরস্তী(মূর্তিপূজা) হটাতে পেরেছে? সবই তো রয়ে গেছে আগের মতো, পার্থক্য শুধু এটুকুই, আগে ছোট ছোট মূর্তি গড়ে পূজা করা হতো, এখন তার পরিবর্তে ছয় হাত আট হাত কবরের পূজা করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের আর কোথাও আমি এত কবর পূজার ধুম দেখিনি। প্রত্যেক গ্রামেই এরকম দু-একটি কবর আছে যার ওপরে লাল, হলুদ, সবুজ পতাকা উড়ছে, এবং সেখানে দু-একজন মলঙ্গ (ফকির) অথবা মুজাবর (পান্ডা) এসে ঘাঁটি গেড়েছে। তাদের প্রাত্যহিক কাজ হলো, ভূত জিন তাড়ানো, তাবিজ, কবচ দেওয়া আর সন্তান কামনায় আসা ভক্তদের আশার বাণী

শুনিয়ে কিছু উপার্জন করা। সত্যি কথা বলতে কি অজ্ঞানতা এবং অন্ধবিশ্বাস এদের মধ্যে এখনও বোলো কলায় বর্তমান।

রেল এবং সড়ক উভয় পথের ধারেই এখানে অনেক জলসত্র আছে। জলের এখানে খুবই অভাব। রেল স্টেশনে, রাস্তার কাছে পাঠান কুলিরা ব্যস্ত কিন্তু সেই অবস্থাতেও কাঁধে তাদের বন্দুক আছেই। বন্দুক রাখার প্রবণতা এদের এত বেশি যে, মনে হয় এরা ঘুমোবার সময়ও বন্দুক কাঁধে রেখে শোয়। লন্ডীকোটল থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত, খাইবার রেলওয়েজ বলতে গেলে এদের নিজস্ব। টিকিট না কেটে পাঠানরা রেলের উঁচু ক্রাশের কম্পার্টমেন্টে বহাল তবীয়তে শুয়ে বসে যাতায়াত করে। কোনো টিকিট পরীক্ষক বা স্টেশন মাস্টার নিজের জীবনের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হয়নি যে এদের বিরুদ্ধে আইন মান্ফিক ব্যবস্থা নেবে। রেললাইনের দুপাশে তো এদেরই রাজত্ব। পাঠানরা মনে করে তাদের রাজত্বে ঢুকে ইংরেজরা রেল চালাবে আর সেই রেলে তারা পয়সা দিয়ে চড়বে এরকম অন্যায্য আবদার চলতেই পারে না। প্রথমে লন্ডীকোটল থেকে পেশোয়ারের ভাড়া ধার্য হয়েছিল দেড় টাকা, এখন তা কমিয়ে ন-আনা হয়েছে। এই ন-আনাও পাঞ্জাবী কিংবা অন্য প্রদেশের লোকেরা দেয় কিন্তু পাঠানদের তো ঘরের রেল।

জমরুদ থেকে খানিক এগোলেই খাইবার গিরিপথ। তার প্রধান অংশ শেষ হয়েছে লন্ডীকোটলের খানিক আগে। এই দূরত্ব কুড়ি মাইলের মতো। এই পথের দুপাশের বৃক্ষ বনস্পতিহীন নগ্ন পাহাড়গুলো অতীতের গৌরবময় ইতিহাসকে আজও যেন নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। এই পথ ধরেই হয়তো একদিন সম্রাট অশোক প্রেরিত ধর্মদূতেরা ভারত থেকে পশ্চিমের দিকে গিয়েছিল। অশ্বশস্ত্র সজ্জিত সূর্য কিংবা চন্দ্র বংশীয় দিগ্বিজয়ী রাজাদের চতুরঙ্গ বাহিনী এই পথেই গিয়েছিল কাম্বোজ, গান্ধার, বাহলিক, পারসিক অঞ্চলে, উড়িয়েছিল ভারতের বিজয় পতাকা। আবার এই পথেই দারায়োশ, আলেকজান্ডার, কনিষ্ক, সুলতান মাহমুদ, চঙ্গিজ খান, তৈমুরলং নাদিরশাহ এবং আহমদ শাহ আবদালীর মতো হানাদারেরা এসেছিল ভারতবর্ষে হামলা করতে। কোনো সন্দেহ নেই যে এই সমস্ত পর্বতমালা তাদের দুর্গমতা ইত্যাদির সাহায্যে পররাজ্য গ্রাসকারীদের বাধা দেবার চেষ্টা অবশ্যই করেছিল, কিন্তু একাকী কিছু পাহাড় কিংবা কোনো নদী শুধু কি তার দুর্গমতা অথবা প্রবল শ্রোত দিয়ে কোনো লোভী লুটেরার বাহিনীকে চিরকাল ঠেকিয়ে রাখতে পারে? খানিকটা বিলম্বিত করতে পারে মাত্র। কিন্তু দেশের জনতা, যাদের দায়িত্ব ছিল ওই পর্বত নদীর সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়া, তারা তো তখন আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে কালক্ষেপণ করছিল। এক সময় ছিল যখন পাটনার চন্দ্রগুপ্তমৌর্য কিংবা অশোকের পতাকা আজকের ‘কাফের কোট’-এর ওপরেও সর্গীরবে উড়ত। তখন এটা ছিল দেবভূমি। সর্বত্র প্রেম, দয়া আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা চলত। কিন্তু আজকের গান্ধার ভূমি, এখন দস্যু, খুনী, মূর্থ এবং মিথ্যাবাদীদের বাসস্থান।

পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত মোটর গাড়ি যাতায়াত করে। লন্ডীখানা পর্যন্ত ব্রিটিশদের তৈরি রাস্তা আছে যা খুবই সুন্দর এবং পাকা। তারপরই আমীরের রাজত্ব। রাস্তা সেখানে কাঁচা এবং এবড়ো-খেবড়ো। এই সম্তর আশি মাইল পথ পার হতে মোটর গাড়িতে দুদিন লাগে। তবে এখন আমীরের তরফ থেকেও রাস্তা মেরামতির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। আশা করা যায় যে আগামী দু-এক বছরের মধ্যে ওপাশের রাস্তাও পাকা এবং চওড়া হয়ে যাবে। তখন সময়ও প্রায়

সাত-আট ঘন্টা কমে যাবে। লোকে খুব আরামে পেশোয়ার থেকে কাবুল পৌঁছে যাবে। আগে কাবুলে যেতে কোনো পাসপোর্ট লাগত না, কিন্তু যখন থেকে কাবুল স্বাধীন হয়েছে তখন থেকে পাসপোর্ট নেওয়াটা আবশ্যিক হয়ে গেছে এবং ওটা পেতেও যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়।

আমীর আমানুল্লাও মুস্তাফা কামাল পাশার মতো সংস্কারের কাজে সাফল্য লাভ করতেন যদি তিনি তুরস্কের জনতার মতো জনতা আফগানিস্তানে পেতেন। তিনি প্রাণপন চেষ্টা করছেন যাতে আফগানিস্তানে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে, যাতে লোকের ধর্মাত্মতা এবং অন্ধ বিশ্বাস দূর হয়। মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায় ভালোবাসা ও দেশপ্রেমের এক সূত্রে গ্রথিত হয়।

আগে আফগানিস্তানে প্রথা ছিল যে যদি কেউ হিন্দু থেকে মুসলমান হয় তাহলে তাকে রাজকোষ থেকে কিছু পুরস্কার দেওয়া হবে, তার জিজিয়া মাফ হয়ে যাবে, এবং তাকে আর বিশেষ ধরনের পোশাক পরে বাইরে বেরোতে হবে না। মোটামুটিভাবে সংখ্যালঘুদের জন্য যেসব বাধ্যবাধকতা ছিল, তা থেকে সে মুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু এখন সে সব বন্ধ। এখন সকলেরই একটা পরিচয় আফগান। হিন্দু না মুসলমান সে প্রশ্ন পরে। সকলের জন্য এক পোশাক। এক ভাষা— পশতু। জিজিয়া ইত্যাদি বতিল। হিন্দু-মুসলমানের জন্য আলাদা স্কুল নেই, একই স্কুলে সব ধর্মের ছাত্র পড়ে। উচ্চশিক্ষার্থে জার্মানিতে যাওয়া আফগান ছাত্রদের মধ্যে অনেক হিন্দু আফগানও আছে। আমীর আমানুল্লা সব বিষয়ে তাঁর হিন্দু প্রজাদের অন্যদের সঙ্গে সমান অধিকার দিয়েছেন। সরকারি আমলা পদে কিংবা আফগান সামরিক বাহিনীতে তিনি হিন্দুদেরও প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। কিন্তু আফগানিস্তানের হিন্দুরা বড় দুর্ভাগা। তারা মুখতা বশত আমীরের এই মহৎ চেষ্টার সহযোগী না হয়ে নানা কৌশলে নিজের সন্তানদের অন্যত্র পাঠাবার চেষ্টা করছে। অন্য দিকে মোল্লার দল সব সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করার জন্য ওত পেতে বসে আছে। এর জন্য আমীর আমানুল্লাকে প্রতিটি পদক্ষেপে অত্যন্ত মেপে মেপে ফেলতে হচ্ছে। এখনও তাঁর কিছু সময় প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের সন্তানদের উঠে আসতে এখনও কিছু সময় লাগবে। তারপরই মোল্লা মৌলবিদের ভূত আফগান জনগণের ঘাড় থেকে চিরকালের জন্য নেমে যাবে। ইউরোপে পাঠানো ছাত্ররা তাদের শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরুক। দেশের স্কুল কলেজ থেকে নবীন ছাত্রের দল বেরিয়ে আসুক তখন আমীরের হাত অনেক শক্ত হয়ে যাবে। আজ মোল্লা মৌলবিদের চাপে অনেক মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তখন ওই অবস্থা থাকবে না। সুশিক্ষিত এবং স্বাধীন আফগানিস্তান এশিয়ার এক বড় শক্তি হিসাবে গণ্য হবে। একদিকে কাবুলের এই অবস্থা আর অন্য দিকে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা দেখে আকাশ পাতাল ফারাক মনে হয়। এই দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণ সমস্তভাবে হিন্দুদের দলিত মথিত করে গোলাম বানাবার চেষ্টা করে চলেছে সর্বতোভাবে। পাঞ্জাব সরকার আয়কর বাবদ যে রাজস্ব পায় তার সিংহভাগ আসে হিন্দুদের কাছ থেকে। যেদিন থেকে ফজল হুসেন মন্ত্রী হয়েছেন, সেদিন থেকে হিন্দুদের মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়েছে। স্কুলে ছাত্রদের ফিস ধার্য হয় তাদের পরিবারের দেওয়া আয়করের ভিত্তিতে। আর এই নিয়মের ফলে হিন্দু ছাত্রদের স্কুলে বেশি ফি দিতে হচ্ছে। আগেও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে হিন্দু স্কুলগুলো সরকারি গ্রান্ট পেত। এখন তো ফরমান জারি হয়েছে ছাত্র বেতন থেকেই স্কুলের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। সরকারি গ্রান্ট কোনো ক্রমে পেলেও পরিমাণ অনেক কমিয়ে

দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে মুসলিম স্কুলগুলোর জন্য সরকারি কোষাগার উন্মুক্ত রয়েছে। তাদের গ্রাট পাওয়ার নিয়ম সহজ, পরিমাণও বেশি, আবার ছাত্রদের ফিসও কম। শিক্ষা বিভাগের সর্বস্তরে চলেছে হিন্দু বিতাড়ন পর্ব।

শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই নয়, ভূমি ব্যবস্থা থেকেও হিন্দু বিতাড়নের পদ্ধতি পাকা হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাবে জারি অকৃষি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রামাঞ্চলে জমি কেনায় নিষেধাজ্ঞার কথা আগেই বলেছি। বাধ্য হয়ে হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে শহরমুখি হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও তাদের সুখে নিদ্রা যাবার সুযোগ নেই। হিন্দু প্রধান তেজারতি কারবারেও নানা বিধি নিষেধ আরোপিত হতে যাচ্ছে। এর ফলে হিন্দুদের এই ব্যবসা থেকে সরে আসতে হবে। শহরে হিন্দুদের অনেক মিষ্টির দোকান ছিল। মুসলমানরা সংগঠিতভাবে সেগুলো বয়কট করে এবং নিজেদের মিষ্টির দোকান খোলে। স্বজাতির সহযোগিতায় এই ব্যবসাতে তারা ভালোই সাফল্য লাভ করেছে। হিন্দুদের জন্য সরকারি চাকরির দরজা প্রায় বন্ধ বললেই হয়। সর্বত্র মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত মুসলমানরা তাদের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে একের পর এক ডেপুটেশন দিয়ে চলেছে। এখন সেখানে প্রতিটি বিষয়ই হিন্দু-মুসলমান দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। হিন্দুদের ধর্মস্থান, দেবমন্দিরগুলির অবস্থা শোচনীয়। সরকারি, বেসরকারি সর্বস্তরেই মুসলমান তোষণ চলছে। এই হাল আমলে পেশোয়ারের এক হিন্দুর বাগানে রাতারাতি মসজিদ উঠে গেলো। এরকম ঘটনা এখানে নিত্য ঘটছে। খোলা বাজারে প্রকাশ্যে গোমাংস বিক্রি হচ্ছে। চাকরি, জমি, ব্যবসা, সব কিছু থেকেই যেভাবে হিন্দুরা বিতাড়িত হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এই অঞ্চলে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

### পুনছ

কাশ্মীর রাজ্যের অধীনে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য আছে, যার মধ্যে পুনছ একটি। পুনছের রাজপরিবার কাশ্মীর রাজপরিবারেরই একটি শাখা। এখানকার ভূমির সর্বাংশই পার্বত্য। ওপরের দিকের পর্বতশ্রেণী সর্বদাই তুষারাচ্ছাদিত। এখানকার পাহাড়গুলো বেশ শ্যামল সবুজ, বৃক্ষ বনস্পতিতে পূর্ণ। রাজধানী পুনছ এক পর্বত শৃঙ্খলার মধ্যে পুনছ নদীর কিনারায় অবস্থিত। সমুদ্রতট থেকে এ জায়গার উচ্চতা তিনহাজার তিনশো ফুট। শীতের দিনে এখানে সর্বত্র তুষারপাত হয় কিন্তু নদীর ভলে শ্রোত থাকে। উৎপন্ন ফসলের বেশিরভাগটাই ধান। ভাত এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য। গম, মকাই ইত্যাদি খাদ্যশস্যও কিছুটা উৎপন্ন হয়। কাশ্মীরের জাফরানের যেমন সারা দেশ জুড়ে খ্যাতি তেমনই খ্যাতি পুনছের ওচ্ছির। এগুলো এক ধরনের ছত্রাক জাতীয় ফসল। শুকনো করে, বাইরে চালান দেওয়া হয়। পুনছে শুকনো এক সের ওচ্ছির দাম সাড়ে তিন টাকা। লাহোর প্রভৃতি শহরে দাম বেড়ে পাঁচ-ছ-টাকা সেরে গিয়ে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরীদের কাছে ওচ্ছির তরকারি এক উপাদেয় খাদ্য।

দীর্ঘ লোমওয়ালা ভেড়া এখানে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু শীতপ্রধান জায়গা অতএব পশমি পোশাকের আধিক্যই বেশি। কাশ্মীরের মতো এখানেও হিন্দুর সংখ্যা খুব কম। মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ মাত্র। গ্রামে শুধুমাত্র মুসলমানদের বসতি। হিন্দুরা প্রধানত শহরে থাকে এবং ব্যবসা অথবা চাকরি করে।

পুনছ রাজ্যের লোকসংখ্যা আট লক্ষ, আয়তন এক হাজার বর্গমাইল। রাজ্যের বার্ষিক

আমদানি এরকম— রাজস্ব খাতে আয় হয় সাড়ে চার লক্ষ টাকা, চুঙ্গি কর (অকটয়) থেকে আয় আড়াই লক্ষ টাকা, বনজ সম্পদ থেকে আয় তিন লক্ষ টাকা এবং স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ আয় ষাট হাজার টাকা। পুনছের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহারাজ গুলাব সিংহের আমলে। যিনি শিখদের হস্তচ্যুত হওয়া কাশ্মীর রাজ্যকে ইংরেজদের কাছ থেকে কিনেছিলেন। প্রথম দিকে কাশ্মীরের মহারাজা পুনছকে জায়গির হিসাবে তাঁর ভাইকে দিয়েছিলেন। বর্তমানে পুনছ কাশ্মীরের একটি করদ রাজ্য। ভারতে যেভাবে বৃটিশ শাসকেরা দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখে ঠিক তেমনভাবে কাশ্মীরের রাজসরকারও পুনছের ওপরে দৃষ্টি রাখে। এর অতিরিক্ত রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি তথা অ্যাডভাইসার (পরামর্শদাতা) একজন ইংরেজ, যে সরাসরি বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত।

পুনছের ফসল বলতে প্রধানত ধান, তারপর মকাই এবং সামান্য পরিমাণে গম। গুচ্ছি ফসল হিসাবে গণ্য না হলেও কৃষিজ উৎপাদন হিসাবে নিশ্চয়ই গণ্য হবে, কারণ এখানে এর ব্যাপক চাষ হয়। রাজ্যের বাইরে গুচ্ছি নিয়মিত রপ্তানি হয়। বনজ সম্পদের মধ্যে দেবদারু, দার আর চির (পাইন)—এর কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাড়ি তৈরিতে কাঠের সঙ্গে এরা পাথর ব্যবহার করে। পুনছের রাজমহল এবং অন্যান্য বড় বড় বাড়ির ছাদ টিনের। যেহেতু গ্রীষ্মের ঋতুতেও এখানে মোটামুটি ঠান্ডা থাকে অতএব রোদ্দুরের তাপে টিন গরম হয়ে যাবার ব্যাপার থাকে না। আবার শীতকালে যখন প্রচুর তুষারপাত হয় সেই জমা তুষার সূর্যের তাপে গলে, ঢালু এবং ঢেউ (করোগেটেড) খেলানো টিন বেয়ে বৃষ্টির জলের মতো নিচে গড়িয়ে যায়, তুষারের ভার ছাদকে বইতে হয় না। আগে পুনছে লোহা পাওয়া যেত, বর্তমানে ওই ব্যাবসা বন্ধ হয়ে গেছে। পুনছে কয়লা, সীসা ও তামার খনি আছে, কিন্তু এখনও তার উত্তোলন শুরু হয়নি।

### ভাষা, বেশভূষা

ভাষা প্রধানত জম্মু অঞ্চলের ডোগরি। বেশভূষার অনেকটাই পাঞ্জাবীদের মতো। পুরুষের পোশাক পাজামা, (সালোয়ার নয়) কামিজ, কোট এবং সাফা ( পাগড়ি)। মেয়েরা চুড়িদার পাজামা, কামিজ এবং ওড়না ব্যবহার করে। এখানে মেয়ে পুরুষ সকলেই জুতো পায়ে দেয়। পাঞ্জাবের মতো এখানেও বাড়ির ছাদ, গলিপথ এবং ব্যবহৃত বাসনপত্র অত্যন্ত অপরিষ্কার, নোংরা। গ্রামের লোকদের পোশাক পরিচ্ছদও খুব অপরিচ্ছন্ন।

পুনছ রাজ্যে হিন্দু আর শিখের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। শিখদের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, এবং তাদের বেশিরভাগই চাষ-আবাদের কাজে যুক্ত। চাকরি উপলক্ষে আসা কিছু কাশ্মীরী ব্রাহ্মণও এখানে আছে। মুসলমানদের মধ্যে শুদ্ধনদের (যারা ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমান হয়েছে) সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তারপর যথাক্রমে মঙ্গরাল (রাজপুত) এবং গুজ্জর। যদিও এরা এখন কটুর মুসলমান কিন্তু পুরানো জাতিভেদ প্রথাকে এখনও নিজেদের মধ্যে মেনে চলে। নিজেদের চেয়ে নিচু বংশে এরা মেয়েদের বিয়ে দেয় না। গুজ্জরদের মেয়েদের মধ্যে এখনও লক্ষ্মী ইত্যাদি ধরনের নাম পাওয়া যায়।

### কাশ্মীর

ভারতবর্ষের স্বর্ণ কাশ্মীর হিমালয় পর্বতমালার মধ্যভাগে অবস্থিত। কাশ্মীরের জনসংখ্যার শতকরা

পাঁচানব্বই ভাগ মুসলমান এবং মাত্র পাঁচ ভাগ হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে তাদের ধরা হয় যারা মহারাজ রণজিৎ সিংহের কাশ্মীর জয়ের পর এখানে এসে বাস করছে। এই আগন্তকেরা এদেশে এসেছে একশো বছরেরও বেশি হয়ে গেছে তথাপি এরা এদেশের ভাষা, বেশভূষা ইত্যাদি সব কিছু থেকে সরে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। এতদিনেও তারা বহিরাগতই থেকে গেছে কাশ্মীরী হতে পারেনি। পাঞ্জাব থেকে কাশ্মীরে এসে বসত করা লোকজনের মধ্যে মহীওয়ালদের (ভূমিহার) সংখ্যাই বেশি। এরা সাধারণত গ্রামের দিকে থাকে এবং চাষবাস করে। কাশ্মীরে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তেরো লক্ষ আর কাশ্মীরী পণ্ডিতদের (ব্রাহ্মণ) সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। মুসলমানদের মধ্যে সামান্য সংখ্যককে বাদ দিলে বাকিরা সেই কাশ্মীরী হিন্দুদের সন্তান যাদের মুসলমান শাসকেরা জোর করে ধর্মান্তরিত করেছিল। হিন্দু-মুসলমান সমস্ত কাশ্মীরীদের পোশাক হলো একটা লম্বা টিলে ঢালা চোগা, অনেকটা বেশি বুলের কামিজের মতো, যার হাতা টিলে এবং প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত কিছু বড়। স্ত্রী পুরুষের চোগায় কোনো তফাত নেই। পুরুষেরা মাথায় সাফা অর্থাৎ পাগড়ি বাঁধে। মেয়েরা ভেড়ার লোমের দড়ি দিয়ে চুলে অনেকগুলো বিনুনি বেঁধে পিঠে ঝোলায়। মাথায় একটা ছোট চাদর মতো রাখে যেটা আবার পিঠের সঙ্গে ঝোলানো থাকে। কেউ কেউ আবার চাদরের নিচে টুপিও পরে। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মেয়েরা চাদরের নিচে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাতলা একটা কাপড় ঝোলায় এবং লাল অথবা অন্য কোনো রঙের কোমরবন্ধনী ব্যবহার করে। পায়ে জুতো কিংবা চপ্পল থাকে।

নেপালীদের বাড়িঘরের সঙ্গে কাশ্মীরীদের বাড়িঘরের অনেক সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে অধিকাংশ বাড়ির ছাদ খড় অথবা শণ দিয়ে ছাওয়া। শহর কিংবা শহরতলীতে ছাদে কাঠের টালি ব্যবহার করা হয়, যার নিচে ভূর্জপত্র বিছানো থাকে। এসমস্ত বাড়ির ছাদে অনেক সময় লম্বা লম্বা ঘাস গজাতে দেখা যায়। শহরের ধনীগৃহের ছাদে এখন টিনের ব্যবহার বাড়ছে। দেবদারু, বয়ার, চির প্রভৃতি কাঠ ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ বাড়ির দেয়ালও কাঠের। কাঠের ওপরে ফুল লতা পাতা ইত্যাদি নানা ধরনের শিল্প কর্মও অঙ্কিত থাকে। তা দেখতেও সুন্দর লাগে এবং সুকৃতির পরিচয় বহন করে। কাশ্মীরের অপরিসর রাস্তা, গলিপথগুলো প্রচণ্ড নোংরা দুর্গন্ধময়, আবর্জনা পূর্ণ। অপরিচ্ছন্নতার বিচারে কাশ্মীরীরা তিব্বতী কিংবা চিনাদের চেয়ে সামান্য পিছিয়ে। নাকে কাপড় না দিয়ে এদের গলিপথে হাঁটা অসম্ভব। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যথেষ্ট বেশি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তারাও বাড়িতে আলাদা পায়খানা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। গলি বা বাড়ির উঠোনই সে কাজে ব্যবহৃত হয়।

### কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ

কাশ্মীরে এদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মতো। শিক্ষায় এরা বেশ অগ্রসর। এদের মধ্যে বেশ কিছু গ্রাজুয়েটও আছে। বাঙালিদের মতো কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা কেরানিগিরি কিংবা অন্য কোনো চাকরি করা পছন্দ করে। দোকানদারি কিংবা অন্য কোনো ধরনের শ্রমসাধ্য কাজে এদের খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। আর এই কারণেই এদের মধ্যে বেকারি দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। একজন গ্রাজুয়েট একটা কুড়িটাকার চাকরির জন্য মাথা কুটে মরছে। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া এদের সমাজের প্রথা এবং সেজন্য সমাজে বিধবার সংখ্যাও বেশি। আবার চাকরি উপলক্ষে

শহর থেকে দূরে থাকার জন্য অনেক ব্রাহ্মণ ছেলেদের সারা জীবনে বিয়ে করাই হয় না। অনেকে তো শুধু বিয়ে করার জন্যই মুসলমান হয়েছে। যুবতী বয়সের বিধবাদের সংখ্যা বাড়ার ফলে সমাজ কলুষিত হচ্ছে। যুবক কাশ্মীরীদের মধ্যে অনেকে বিধবা বিবাহের পক্ষে, কিন্তু এর বিরোধীরাই এখনও সংখ্যায় বেশি। ব্রাহ্মণেরা বিগত জনগণনায় অনেক কষ্টে নিজেদের বর্তমান সংখ্যাকে বজায় রাখতে পেরেছে। এক শিক্ষিত কাশ্মীরী পণ্ডিত (ব্রাহ্মণ) বলছিলেন— একদিকে বিধবা মেয়ে এবং অবিবাহিত পুরুষদের অসন্তোষ অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের প্রলোভন, যার ফলে আগামী জনগণনায় আমাদের সংখ্যা ভালো রকম কমে যাবার আশংকা আছে। নিজেদের সম্প্রদায়ের দূরবস্থায় দুঃখ করে তিনি বলছিলেন— আমাদের সম্প্রদায় আদিম জনগোষ্ঠীর কেউ নয়, আবার আধুনিকও নয়, তাদের ইমানদারও বলা চলে না, আবার পুরোপুরি বেইমানও তারা নয়। এরা ধার্মিকও নয় আবার অধার্মিকও নয়। এরা বিচিত্র এক সম্প্রদায়। তাঁর আরও অভিযোগ আমাদের জাতির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। একটা ঘটনার কথা বলা যাক— একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত লিখিতভাবে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে শুদ্ধির বিধান দেয়, কিন্তু পরে সে বলে ওই বিধান সে দেয়নি। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের বিপদের ঘণ্টা বেজে গিয়েছে।

কাশ্মীরী পণ্ডিতদের প্রধান খাদ্য ভাত ও মুগের ডাল। মেথিল ব্রাহ্মণদের বিদ্যাবুদ্ধি ও আহার বিহারের সঙ্গে এদের অনেক মিল আছে। এদের মধ্যে শক্তি উপাসনার চল আছে, এবং সেই উপলক্ষে পঞ্চ ‘ম’ কার সহযোগে বামমাগী সাধনাও চলে। যদিও এরা একান্তে মদ্যপান করে কিন্তু বাইরে সমাজপতির ভূমিকা পালনের সময় মদ্যপানের নিন্দা করে। চৌকা ধর্ম অর্থাৎ রান্নাঘরের বাছ বিচার মানে তবে বিহারের সঙ্গে তার বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ডালভাত রেঁধে, বাসন পশমি কাপড়ে মুড়ে, একটা ঝুড়িতে রেখে কাঠের বাঁকে করে মুসলমান চাকরের হাতে তা স্থানান্তরে পাঠানো চলে, এবং সেই খাদ্য গ্রহণে ব্রাহ্মণদের কোনো দ্বিধা বা বাধা নেই। মুসলমান জল ভরে দিলে তা পান করা চলে। রান্নার বাসনপত্র মুসলমান চাকরেরাই পরিষ্কার করে শুধু দৃষ্টি রাখতে হয় কোনো খাবার-দাবারে তার প্রত্যক্ষ স্পর্শ না লাগে। পশমি কাপড়ে মোড়ার পর ছোঁয়া লাগলে দোষ নেই।

আপনি যদি কোনো কাশ্মীরী বন্ধুর বাড়ি যান, তাহলে তারা অবশ্যই আপনাকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করবে। এই উষ্ণ পানীয় তৈরির জন্য কাশ্মীরীরা এক বিশেষ ধরনের পাত্র ব্যবহার করে যার নাম সামোভার। সামোভার এখন ইউরোপ এবং অন্যান্য শীত প্রধান দেশেও খুব জনপ্রিয়। এই পাত্রের মাঝখানে একটা নল থাকে যেখান দিয়ে কাঠকয়লা ভরা হয়। পাত্রের নিচের দিকে কয়েকটা ছিদ্র থাকে যা দিয়ে বাতাস ঢুকতে পারে। নলের চারদিকের ছোট পাত্রে জল চা-পাতা ভরে বন্ধ করা থাকে। চা পানের আগে তার মধ্যে চিনি, এলাচ, কাবাবচিনি, দারুচিনি ইত্যাদি গুঁড়ো করে মেশানো হয়। দুধ মিশিয়ে, ছেকে চা পানের প্রথা এখানে নেই। ছোট ছোট ফুল পাতা আঁকা পেয়ালা ভরে চা আপনার কাছে আসবে কিন্তু খবরদার আপনি খালি হাতে তা ধরতে যাবেন না। ধরলেই আপনার শিষ্টাচার বোধ সম্পর্কে সকলের সন্দেহ জাগবে। আপনি সেগুলিকে কাপড় দিয়ে ধরুন, সেটাই শিষ্টাচার সম্মত নিয়ম। যে কাপড়টা দিয়ে ধরবেন, সেটা যদি বছর কয়েক ধোপা বাড়ির মুখ না দেখে থাকে তাতে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু হাতের প্রত্যক্ষ ছোঁয়া নৈব নৈব চ। একই ফরাসে কোনো মুসলমান বসে যদি চা কিংবা জলপান করে তাতে কোনো



দোষ নেই। বস্তুত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের আচার বিচারকে চৌকা ধর্ম না বলে বস্তু ঢাকন ধর্ম বললেই ঠিক হয়।

ক

কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কাহিনি শুনলাম। প্রাচীন কালে শ্রীনগরে ছিল এক হিন্দুরাজার রাজত্ব। রাজার রানি ছিলেন অতীব সুন্দরী এবং সেই সঙ্গে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। কোনো এক সময়ে তাঁর দেশের ওপরে ভারতবর্ষের দিক থেকে আক্রমণ হয়। রাজা নিজে সসৈন্যে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সীমান্তে গেলেন। রানি নিত্য এক মন্দিরে গিয়ে বৃদ্ধ এক ব্যাস (কথক)-এর কাছে কথা শুনতেন। একদিন সেই বৃদ্ধ ব্যাসের শরীর অসুস্থ হওয়ায় মন্দিরে যেতে পারলেন না। বৃদ্ধের একটি বিধবা মেয়ে ছিল। মেয়েটির একটি যুবা বয়সের বিদ্বান পুত্র ছিল। অসুস্থ বৃদ্ধ মাতামহ একান্ত নিরুপায় হয়ে দৌহিত্রকেই সেদিন তাঁর জায়গায় যেতে বললেন। যে সময় যুবক তার আসনে বসতে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রানি মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরে নিত্য সেই বৃদ্ধ ব্যাস থাকে বলে রানি কোনো পর্দার আড়াল নেননি। যুবক রানিকে দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেলো। ঘরে ফিরে যুবক কামতাড়নায় অস্থির হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। যুবকের মা ছেলের অসুস্থতা দেখে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত হয়ে পড়ে। বারবার পুত্রের অসুস্থতার কারণ জানতে চেয়েও সদুত্তর পায় না। অবশেষে যুবক নিরুপায় হয়ে সংকোচের সঙ্গে মাকে তার অসুস্থতার কারণ বলল। এবার বিধবা মায়ের চিন্তা, কিভাবে একমাত্র পুত্রের প্রাণ বাঁচানো যায়। রানি রোজই নানারকম দান খয়রাতকরতেন। ব্রাহ্মণী একদিন তাঁর দরবারে গিয়ে উপস্থিত। রানি তাঁকে বললেন— ‘তোমার যা ইচ্ছা, চাও’। ব্রাহ্মণী রানিকে যা চাইবেন, তাই দেবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে বললেন— ‘আমার পুত্রকে জীবন দান করুন।’ রানি স্বভাবতই দ্বিধায় পড়লেন, কিন্তু কথাও দিয়ে ফেলেছেন। বৃদ্ধ ব্যাসের অসুস্থতার জন্য মন্দিরে অন্য এক নতুন পণ্ডিত এসে ব্যাসের আসনে বসেছিলেন। রানি তাঁর কথকতা শোনার পর তাঁকে প্রশ্ন করলেন— ‘যদি কোনো মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধর্ম বিসর্জন দিতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি কি বিধান দেবেন।’ পণ্ডিত বললেন— ‘শাস্ত্র বলছে কোনো প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি ধর্ম ত্যাগের প্রশ্ন ওঠে, সেক্ষেত্রে প্রাণ বাঁচানোই প্রধান ধর্ম। শাস্ত্রের এই ব্যাখ্যা শুনে রানি সেই বিধবার পুত্রের কাছে সতীত্ব বিসর্জন দিলেন। কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে মন্দিরের পুরানো ব্যাস তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। তিনি তাঁর দৌহিত্রের খবর জানতেন না। রানি তাঁকেও একই প্রশ্ন করলেন— ‘কারও প্রাণ রক্ষার জন্য ধর্ম বিসর্জন দেওয়া যায় কি?’ ব্যাস বললেন, ‘কারও প্রাণ যদি চলেও যায়, যাক, কিন্তু কোনো আবস্থাতেই ধর্ম বিসর্জিত দেওয়া সমর্থনীয় নয়।’ রানি বললেন— ‘যদি ধর্ম বিসর্জিত হয়ে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত কি?’ ব্যাস বললেন, ‘তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে হবে।’ রানি পরদিনই সেই ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত করে ফেললেন। দেখতে দেখতে এই খবর সমগ্র রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত ঘটনা দেখে মন্ত্রী ভাবলেন যে রাজা যদি জানতে পারেন যে কিজন্য তাঁর প্রিয়তমা পত্নী আত্মাহুতি দিয়েছেন তাহলে না জানি আমাদের কী হাল করবেন। অতএব যেমন চলছে চলুক। পরে সময় সুযোগ বুঝে রাজাকে একটা কিছু বুঝিয়ে দিলেই হবে। এদিকে রাজা তো শত্রু নিপাত করে বিজয় গর্বে রাজধানীতে ফিরলেন। কিন্তু তিনি অবাক

হয়ে দেখলেন নগরের কোথাও আনন্দ উচ্ছ্বাসের চিহ্ন মাত্র নেই। মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে রানি দীর্ঘকাল রাজার বিরহ সহ্য করতে না পেরে অগ্নিতে আত্মহত্যা দিয়েছেন। এই দুঃসংবাদ রাজাকে অত্যন্ত শোকাবুল করে তুলল। তারপর সময়ের প্রলেপে ধীরে ধীরে রাজার শোক অনেকটাই প্রশমিত হয়ে এল। মাঝে মধ্যে রাজা ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করতেন, প্রজাদের কথা শুনতেন। সে রকমই একদিন রাজা যখন নগরে ঘুরছেন সে সময় তাঁর কানে এল এক ধোপানি তার স্বামীকে বলছে যাও তোমার থাকা না থাকার পরোয়া করি না। তুমি না থাকলে অন্য কারও কাছ থেকে আনন্দ নেব তারপর আগুনে পুড়ে স্বর্গে চলে যাব। রাজা সবকথা শুনলেন এবং পরদিন রাজসভায় সেই ধোপা-ধোপানিকে তলব করলেন। তাদের দুজনকে ভয় দেখাতেই, তারা রানি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য রাজাকে জানাল। মন্ত্রী এবং অন্যরাও কোনো মতে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। এরপর রাজা শাস্ত্রের দুরকম ব্যাখ্যা দেওয়া দুই পণ্ডিতকেই ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দুজনেই তাঁদের আগের ব্যাখ্যায় অটল রইলেন। রাজা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, এবং সেদিন থেকে শাস্ত্রের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা জন্মায়। রাজা সসৈন্যে অভিযান চালিয়ে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘর থেকে শাস্ত্রগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করলেন। প্রথমে ভাবলেন ওগুলোকে জলে ভাসিয়ে দেবেন। তারপর তাঁর মনে হলো এগুলোর স্পর্শে জলও দূষিত হয়ে যাবে। সেজন্য তিনি নগরের বাইরে এক বিশাল গর্ত খুঁড়ে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থকে চাপা দিলেন।

কাশ্মীরের শেষ হিন্দু রাজার রাজত্ব কালে লাদাখ থেকে একজন লোক কাশ্মীর এসেছিল। সে তার প্রতিভা এবং বীরত্বের জন্য দেশের প্রধান সেনাপতির পদে আসীন হয়েছিল। এরপর সীমান্তে ভিনদেশীরা আক্রমণ করলে সেনাপতি সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবিলা করতে গেলো। রাজা যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য জ্যোতিষীদের ডাকলেন। জ্যোতিষীরা রাজাকে বলল, যুদ্ধের ফলাফল প্রতিকূল হবে। রাজা তাদের কথা শুনে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেন এবং পরে সন্ন্যাস নিয়ে নগর ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন। এদিকে সেনাপতি রিনচন শত্রু জয় করে ফিরে এসে দেখে সিংহাসন শূন্য। রাজা নিরুদ্দেশ। কিছুদিন পর শূন্য রাজসিংহাসনে সেনাপতি রিনচন নিজেই বসলেন। এতদিন রিনচন কোনো ধর্মকে অনুসরণ করেননি। এবার তিনি পণ্ডিতদের ডেকে বললেন,—‘আমাকে আপনাদের ধর্মের আশ্রয়ে নিয়ে নিন।’ পণ্ডিতেরা বললেন—‘গাধা কোনোদিনই ঘোড়া হতে পারে না। যেহেতু আপনি হিন্দু বংশে জন্মগ্রহণ করেননি, সেজন্য আপনি কোনো অবস্থাতেই হিন্দু হতে পারবেন না।’ রাজা পণ্ডিতদের কাছে অনেক অনুন্নয় বিনয় করলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। অবশেষে রাজা বিরক্ত হয়ে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন—‘আগামী কাল ভোরে যাকে আমি সর্বপ্রথম দেখব, তার ধর্মকেই আমি আমার ধর্ম বলে স্বীকার করব। পরদিন প্রভাতে যে ব্যক্তি রাজার সামনে সর্বপ্রথম আসে সে ব্যক্তি ছিল বুলবুল শাহ। রিনচন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এমনিতেই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে ক্রোধ জমেছিল। বুলবুল শাহ তাঁর মধ্যে প্ররোচনার ইন্ধন যোগাতে থাকল। এক এক করে রিনচন কাশ্মীরের সমস্ত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে শুরু করলেন। এরপর রিনচনের নাম হলো রিনচন গাজী। জোর করে ধর্মান্তরকরণের জোয়ার বইতে লাগল। এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে তাঁর সন্তানের আমলেও চলেছিল। যার ফলে কাশ্মীরের অধিকাংশ হিন্দুই মুসলমান হয়ে যায়। হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া কাশ্মীরীদের সন্তানেরা আজও তাদের নামের সঙ্গে ‘বাট (ভট্ট) গুজ্জর, জাঠ, রাণা (রাজপুত) প্রভৃতি পদবি ব্যবহার করে।

১৩৩৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইসলাম কাশ্মীরের বৃহৎ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণদের এগারোটি পরিবার কোনোক্রমে ইসলামি করণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এরপর সুলতান জয়নাল আবেদিনের (১৪২০-৭০ খৃঃ) প্রশান্ত শাসনকালে কিছু ব্রাহ্মণ অন্য জায়গা থেকেও কাশ্মীরে এসে বসবাস শুরু করে। যাদের মধ্যে কাউল বংশীয়রা অন্যতম। এরা এসেছিল মিথিলা থেকে। এই নবাবগত ব্রাহ্মণদের বলা হতো বানমাসি এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মলমাসি। মলমাসিরা চান্দ্রমাস অনুসরণ করত, আর বানমাসিরা সৌরমাস। তবে এই দুই বংশের মধ্যে আহার, বিহার, বিয়ে ইত্যাদির চল ছিল। এই সুলতানের আমলেই ব্রাহ্মণেরা ফারসি পড়তে আরম্ভ করে এবং তার ফলে তারা উচ্চ রাজপদও পেতে থাকে। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে একশো তেত্রিশটি গোত্র আছে। প্রথমে ছিল ছটি— দত্তাত্রেয়, ভরদ্বাজ, গৌতম, মৌদগল্য, উপমন্যু এবং ধৌম্য। কেউ কেউ আবার কাশ্মীরী পণ্ডিতদের যবন (গ্রিক) এবং পারসিকদের বংশধর বলে মনে করেন, যারা পরবর্তী কালে এই উপত্যকায় বসবাস করতে থাকে।

মুসলমানি শাসনে বড়াশাহ নামে এক বাদশাহ কাশ্মীরে রাজত্ব করতেন। প্রথম দিকে তিনি হিন্দুদের ওপরে প্রচণ্ড অত্যাচার করতেন, পরে কোনো কারণে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে এবং সমস্ত প্রজাদের সঙ্গেই তিনি সমান ব্যবহার করতে থাকেন। লোকে বলত — শান্তি এমনিতে আসেনি। বড়াশাহর মৃতশরীরে এক হিন্দু যোগীর আত্মা প্রবিষ্ট হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু প্রজাদের ওপরে কোনো জোর জুলুম হয়নি। তখন থেকেই কোনো শুভ কাজে মুসলমানের মুখ দর্শন করা ব্রাহ্মণদের শুভ বলে স্বীকৃত হয়। মুসলমানেরাও যজ্ঞোপবীতের খবর পেলেই ব্রাহ্মণ বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। মূর্তিহীন বড়াশাহর মন্দির আজও শ্রীনগরে বর্তমান।

খ

শ্রীনগর কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী। জনসংখ্যা একলক্ষ পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি। সমুদ্রতট থেকে এর উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিট। উচ্চতার জন্য গরমের দিনেও তাপ অনুভূত হয় না। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং তখন ঠান্ডা পড়ে। শীতে বাড়ির আঙিনা থেকে আরম্ভ করে ছাদ, পথ, ঘাট, মাঠ সর্বত্র তুষারে ছেয়ে যায়। দেখলে মনে হয় চারদিকে যেন দেশি চিনির স্তূপ কেউ জমিয়ে রেখেছে। তখন শহরের তাপমান অনেক নিচে নেমে যায় এবং ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি করে গরম কাপড়ের দরকার হয়। অধিকাংশ কাশ্মীরীরাই আংটা কাঙরীর ব্যবহার করে। কাঙরী এক ধরনের ছোট পাত্র যার মধ্যে সবসময় কাঠকয়লা জ্বলে। দোকানদার তার দোকানদারি করতে করতে কাঙরীতে হাঁত সঁকে নেয়। মাঝি তার নৌকা চালায় কাঙরী সঙ্গে নিয়ে এমনকী অফিসের বাবুরা কাজের সময় চেয়ারের কাছে কিংবা ধনী ব্যক্তির ঘরের সোফায় বসে আলস্যে সময় কাটাবার সময়ও কাঙরী সঙ্গে রাখে। এই কাঙরীগুলো খুব হালকা এবং খুব রুচিশীলভাবে তৈরি, মাঝখানে ছোট একটা মাটির পাত্র তার চারপাশই বিরি অথবা তুঁত গাছের কাঠের পাতলা ফালি দিয়ে মোড়া, যাতে দেহের সংস্পর্শে এলে হাঁচকা না লাগে। মাটির পাত্রটির গায়ে একটা হাতল লাগানো থাকে। কাশ্মীরে স্ত্রী পুরুষ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে লম্বা চোগা পরে। ঠান্ডার দিনে সকলেই চোগার মধ্যে ওই কাঙরী নিয়ে চলাফেরা করে, কাজকর্ম করে।

শীতের দিনে ডাল লেকের খানিকটা অংশ জমে শক্ত বরফ হয়ে যায়। সেখানে তখন সৌখিন লোকেরা স্কেটিং করে। শ্রীনগর বেড়াতে এলে কিছু বিচিত্র ধরনের গাছ দেখা যায়। এগুলো হলো সফেদা, বিরি আর বিশেষ করে চিনার। মাইলের পর মাইল জুড়ে রাস্তার দুধারে সাদা ছালের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো সফেদা গাছ। এর খুব বড় বড় ছড়ানো ডালপালা গজায় না। যেটুকু জন্মায় তা কাণ্ড থেকে বের হয়ে একটা আকৃতি নেয়। যার জন্য পর পর গাছগুলোকে সিকড়ের দিক থেকে এবং মাথার দিক থেকে একসারিতেই আছে বলে মনে হয়। পথের সৌন্দর্য বৃদ্ধিই শুধু এই গাছের বিশেষত্ব নয়। এদের প্রধান বিশেষত্ব অত্যন্ত দ্রুত বংশবিস্তার। কোনো একটি ছোট ডাল ভেঙে এনে একটু আর্দ্র মাটিতে পুঁতে দিলেই কিছুদিন পর সেটি গাছে পরিণত হবে। কাশ্মীরের সমতলে আরও কয়েক ধরনের গাছ আছে কিন্তু সেগুলো চিনার কিংবা দেবদারুর সমতুল্য নয়।

কাশ্মীর যদি ভারতবর্ষের স্বর্গ হয়ে থাকে তাহলে চিনার সেই স্বর্গের কল্পবৃক্ষ। এর ওপর যদি এই গাছে ফল ধরত তাহলে বলা যেত ‘সোনায় সোহাগা’। শতাধিক ফিট উঁচু বিশাল ডালপালা বিস্তার করা সুন্দর এক গাছ এই চিনার। এর ফুল পাতাও খুব সুন্দর। চিনারের ডালপালা নীচে থেকে ধাপে ধাপে বেড়ে ওপরে উঠেছে। ফলে এই গাছ এত সুন্দর ছায়া দেয় যা বোধ করি এদেশের আর কোনো গাছই দেয় না। এর কাণ্ডও খুব সুন্দর। কিন্তু চিনার কাশ্মীরে রাজবৃক্ষ। কেউ চিনার গাছ কাটতে পারে না। শুকিয়ে বা ঝড়ে ভেঙে গেলেও তা রাজ সম্পত্তি। চিনার কাঠের কাঠকয়লার আগুন বহুক্ষণ ধরে জ্বলে, সহজে নেভে না এবং ওপর থেকে নিভে গেলেও ভেতরে ভেতরে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। তবে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে তো আর চিনার কাঠের কয়লা জোটে না, তাই তারা পাতা ঝরার মরসুমে যখন চিনার গাছের পাতা ঝরে যায়, তখন সেই শুকনো পাতা জড়ো করে শীতের জন্য জমিয়ে রাখে। চিনারের পাতার আগুনও বহুক্ষণ ধরে জ্বলে। চিনারের মতো তুঁতও রাজবৃক্ষ। এই গাছ রেশম শিল্পের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত। বিরি কাশ্মীরীদের কাছে খুব উপকারি গাছ। কাশ্মীরীদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে যদি কেউ এই গাছের নিচে শোয় অথবা এর ডাল দিয়ে দাঁত মাজে তাহলে কোনো রোগ ব্যাধি তাকে স্পর্শ করবে না। যাক এ তো গেলো এর মহাত্ম্য বর্ণনা। কিন্তু বিরি সাধারণ কাশ্মীরীদের কাছে অত্যন্ত উপযোগী গাছ। কারণ এই গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কাশ্মীর উপত্যকায় শ্রীনগরের কাছে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জলাভূমি আছে। কাশ্মীরীরা এই জলাভূমিকে বলে ডাল। এখানকার লোক এই জলাভূমিকেও জীবনে নানাভাবে ব্যবহার করে। এখানে জন্মানো দীর্ঘ ও ঘন সন্নিবদ্ধ ঘাসের ওপর পাতলা করে মাটির আস্তরণ বিছিয়ে ছোট ছোট খেত তৈরি করে সেখানে নানা ধরনের সবজি ফলায়। ওই ডাল অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মণ পানিফল তোলা হয়। যেখানে জলের গভীরতা কম সেখানে হাজার হাজার বিরি গাছ পোঁতা হয়। যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ার কারণে প্রতিবছর এর ডালপালা ছাঁটতে হয়। বিরির কাণ্ড খুব সুন্দর ও মজবুত, তা দিয়ে নানা ধরনের আসবাবপত্র এমনকী ক্রিকেট খেলার ব্যাট পর্যন্ত তৈরি হয়। বাদশাহী আমলে এ সব কিছুই ছিল শাহী খানদানের জন্য সংরক্ষিত। গ্রীষ্মের দিনে তাঁরা সপরিবারে কাশ্মীরের শীতল আবহাওয়াতে আসতেন। এখানকার ঝিল, এখানকার আপেল, আঙুর, খোবানির বাগানে তাঁরা বেড়াতেন, ফলের আশ্বাদন করতেন, এখানকার প্রবাহিত চশমার (বর্না) সৌন্দর্যে মোহিত হতেন। আজ সেই আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যেও এসেছে। যখন থেকে রাওয়ালপিন্ডি থেকে শ্রীনগরে

সরসরি মোটরে যাতায়াত করা যাচ্ছে তখন থেকে কাশ্মীরে পর্যটকদের আসার সংখ্যা বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেই শুধু নয়, প্রতিবছর ইউরোপ আমেরিকা থেকেও পর্যটকরা দলে দলে কাশ্মীর ভ্রমণে আসেন। পাঞ্জাব অঞ্চলের অনেক ধনী লোক শ্রীনগরে বাড়ি অথবা বাগানবাড়ি কিনে রেখেছে। পর্যটকরা এসে এখানে কোনো বাংলো বাড়ি— যা এখানে শয়ে শয়ে রয়েছে — ভাড়া নেয়, অথবা সেই সব নৌকাবাড়ি (হাউসবোট) ভাড়া নেয় যেগুলো শ্রীনগরের ঝিলে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এই নৌকাগুলো এক ধরনের চলমান বাড়ি। এরমধ্যে শোবার ঘর, বসবার ঘর, লাইব্রেরি, স্নানঘর প্রভৃতির আলাদা ব্যবস্থা আছে। ঝিলম (বিতস্তা) নদীর কিনারা ধরে সারি সারি বিদ্যুৎ স্তম্ভ আছে। হাউসবোটগুলো সেখান থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে ঘর আলোকিত করে। বিদ্যুৎ শ্রীনগরে খুবই সস্তা এর মিটারও ব্যবহারকারির বাড়িতে লাগানো থাকে না। এজন্য দিনের বেলাতে বাতি না নিভিয়ে বাইরে চলে যাওয়া, এখানকার লোকের সহজাত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক নৌকা-বাড়ির সঙ্গে একটি ছোট নৌকা লাগানো থাকে, সেখানে রান্নাবান্না হয় এবং চাকর বাকরেরা রাত্রিবাস করে। এর অতিরিক্ত এখানে এক ধরনের খুব সাজানো গোছানো ডিঙি নৌকা চলে, স্থানীয় ভাষায় যার নাম শিকারা। শিকারা চেপে পর্যটকরা ডাল লেকে কিংবা ঝিলম নদীতে বহুদূর পর্যন্ত বেড়িয়ে আসতে পারে। কাশ্মীরে খেত চুরি হয়। এই আশ্চর্য ব্যাপারটি ঘটে এখানকার ভাসমান সবজি খেতগুলোকে নিয়ে। ওগুলোর ওপরে দাঁড়িয়ে নৌকার মতো দাঁড় বেয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। কাশ্মীরে বেড়াতে আসা পর্যটকদের অধিকাংশই এখনও বিদেশি। ডাল লেকের মধ্যে দু-একটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। কখনও কখনও এই দ্বীপগুলিতে শ্বেতাঙ্গিনী রমণীদের নাচতে কিংবা বনভোজনের আসর বসাতে দেখা যায়। ফুল, ফল আর জল, এই তিনটি জিনিসের জন্য কাশ্মীর বিখ্যাত।

এর আগে আমি লিখেছি যে কাশ্মীরীদের মতো অপরিচ্ছন্ন জাতি পৃথিবীতে খুব কমই দেখেছি। এদের বাড়ির পাশের গলিপথগুলোকে এরা শৌচালয় হিসাবে ব্যবহার করে। রোদ থাকলে তবু নাকে মুখে কাপড় দিয়ে দ্রুত পায়ে পার হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টি হলে এই গলিপথে হাঁটা মানে সরাসরি পায়খানার মধ্য দিয়ে হাঁটা। এটাই বিশ্বয়ের যে এত অপরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও কলেরা বা প্লেগ এখনও চিরস্থায়ী আসন গেড়ে বসেনি। এ সম্বন্ধে ডাক্তার নেব লিখেছেন— ‘The wonder is not that cholera came, but that it ever went away; not that it stew 10,000 (in 1888) victims, that so many escaped its ravages. Enough that cholera came and will come again, aye, and again as long as it is thus prepared for, and invited and feasted by, a city reared in filth, a people born in filth, living in filth and drinking filth.’

### প্রসিদ্ধ স্থান

শংকরাচার্য— শ্রীনগর শহরের পূর্বোত্তর ভাগে একটি ছোট পাহাড় আছে। এবং সেটির ওপরে একটি শিব মন্দির আছে। মুসলমানী আমলে অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরটিকেও অনেক দুর্গতি সহ্য করতে হয়েছে। মুসলমানেরা এটিকে বলে তখত-এ-সুলেমান। কথিত আছে যে প্রসিদ্ধ মূর্তি বিনাশক বাদশাহ সিকন্দর তাঁর মূর্তি ধ্বংসের অভিযানে এই মন্দিরটিকে এই কারণে রেহাই

দিয়েছিলেন যে তাঁর আগের এক মূর্তি বিনাশক সুলতান মাহমুদ গজনভী (৯৮৭-১০৩০ খৃ:) এখানে নামাজ পাঠ করেছিলেন। কাশ্মীরে হিন্দুরাজত্ব আরম্ভ হবার পর আবার এই মন্দিরে পূজার্চনা শুরু হয়েছে। এই মন্দির থেকে সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকা দেখা যায়। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা, তার পিছনের সারিতে হিমাচ্ছাদিত পর্বতমালা মাঝে মাঝে দীর্ঘ ঝিল, জলাভূমির বহুদূর পর্যন্ত দু-সারিতে বিস্তৃত সফেদার গাছ-সর্পিল গতিতে প্রবাহিত ঝিলম। শহর আর শহরতলীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ফলের বাগান, বাগান বাড়ি, সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত মাঠ, চিনারের মধুর ছায়ায় আশ্রিত সমতল ভূমি, সবকিছুই অতীব মনোহর লাগে দেখতে।

শ্রীনগরে এক সময় স্কন্দভবন, ত্রিভুবন স্বামী, ক্ষেম গৌরীশ্বর, বিদ্যামধ্যা, বিক্রমেশ্বর প্রভৃতি অনেক প্রাচীন মন্দির ছিল। সেগুলোর অধিকাংশকে ভেঙে মুসলমান পীরদের নামে মাজার জিয়ারত তৈরি হয়েছে। শ্রীনগরের জামা মসজিদ নির্মিত হয়েছে সিকন্দরের আমলে ১৪০৪ খৃস্টাব্দে। এই মসজিদ নির্মাণের জন্য তিনি তারাপীড়ের (৬৯৬-৯৭ খৃ:) বিশাল মন্দির ভেঙে তার পাথর ব্যবহার করেছেন। মন্দিরের কিছু ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধরাও এই জায়গাকে পবিত্র জ্ঞান করে। লাদাখ এবং সন্নিহিত অঞ্চল থেকে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরাও মাঝে মধ্যে এখানে আসে। তাদের ভাষায় এই জায়গার নাম চিচাঙ-দু-ব্লক-খঙ। স্বর্গীয় মহারাজ প্রতাপসিংহ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কিছু মেরামত করিয়েছেন। এজন্য তিনি দু-দফায় ১৮৯৩ সালে বারো হাজার এবং ১৯১২ সালে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। মহারাজা দ্বিতীয় প্রবরসেন প্রতিষ্ঠিত 'সদ্যাব শ্রী' মন্দির এখন পীর হাজি মুহাম্মদের মাজারে পরিণত হয়েছে। এই মহারাজার প্রতিষ্ঠিত আরেকটি মন্দির 'প্রবরেশ' পীর বাহাউদ্দীনের জিয়ারত।

নসীমবাগা—শ্রীনগর শহর থেকে চার মাইল দূরে শহরের উপকণ্ঠে হজরতবাল নামে একটি গ্রাম আছে। সমগ্র কাশ্মীরের জনতার কাছে এটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে একটি কেশ রক্ষিত আছে যেটিকে পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদের বলে দাবি করা হয়। এখান থেকে স্বল্প-দূরে বাদশাহ শাহজাহানের তৈরি (১৬৩৫ খৃ:) নসীমবাগ আছে। এই বাগানে কয়েকশো চিনার গাছ আছে। বাগান প্রতিষ্ঠা কালে এখানে চিনারের সংখ্যা ছিল বারোশো।

শালিমার বাগ—নসীমবাগের কিছুদূরে ডাল লেকের মধ্যে ছোট একটি দ্বীপভূমি আছে। যাকে সুলালংক বলে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এখানে একটি কুটির নির্মাণ করেছিলেন। আমীর খাঁ জবাবে ১৭৩৭ সালে সেটির অনেক সংস্কার করেন। কিন্তু এখন আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এখানে ঘাসের ফরাসে বসে লোকে পিকনিক করে। ডাল লেকের পূর্বোত্তর দিকে প্রসিদ্ধ শালিমার বাগ। কথিত আছে যে মহারাজা দ্বিতীয় প্রবরসেন প্রথমে এখানে একটি মহল নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীনগরের পশ্চিম করেছিলেন এই মহারাজা। রাজা বনবাসী তপস্বী সুকর্মস্বামীকে দর্শনের জন্য যেতেন, পরে তিনি ওখানে একটা আবাসস্থল নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালে ওই মহলের অস্তিত্ব টিকে থাকেনি। ওই অঞ্চলে শালিমার নামে একটি ছোট গ্রাম গড়ে ওঠে। মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর ১৬১৯ সালে এখানে একটি উদ্যান তৈরি করে নাহ রাখেন 'ফরহ-বখশ' (আনন্দপ্রদ)। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে সুবেদার জাফর খাঁ (১৬৩০ খৃ:) এই উদ্যানের কিছু সংস্কার করে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। ডাল লেক থেকে শালিমার পর্যন্ত একটি খাল রয়েছে। শালিমার বাগ পাঁচশো নব্বই গজ দীর্ঘ এবং ধাপে ধাপে নামতে নামতে নিচের দিকের প্রশস্ততা

প্রায় দুশো সাত গজ। এর চারিদিক ইট আর পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের উচ্চতা দশ ফিট। শালিমার বাগকে চারটি সমান অংশে ভাগ করা হয়েছে এবং এই চারটি অংশ চারটি পৃথক ধাপে অবস্থিত। প্রত্যেক ধাপে বাগানের মধ্যে একটি কুণ্ড আছে এবং একটি পাথরে বাঁধানো নালা সেই কুণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নালার গভীরতা এক ফুটের মতো এবং চওড়া প্রায় দশগজ। এই নালা বেয়ে জল ডাল লেকে ফিরে যায়। বাগানের একদম উচ্চতম ধাপ থেকে জল কালো মার্বেলের ধাপ বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। একসময় বাগানের উপরিভাগ শুধু মাত্র অস্তপুরের বেগমদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। বাগানের মধ্য ভাগে একটি সুন্দর চতুষ্কোণ বাড়ি আছে যার ছাদ কুড়ি ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের স্তম্ভের ওপড়ে দাঁড়ানো। স্তম্ভের গায়ে নানা ধরনের শিল্পকর্ম খোদিত আছে। প্রত্যেক সারিতে স্তম্ভের সংখ্যা ছয়। রবিবারে এখানে খালে জল ছাড়া হয় সেজন্য সেদিন উদ্যানে ভ্রমণার্থীদের প্রচুর ভিড় হয়। বাগান ভর্তি অজস্র প্রস্ফুটিত ফুলের সমারোহ, নৃত্য ভঙ্গিমা ও পর থেকে নেমে আসা জলধারা, চিনারের বিস্তৃত ছায়া দর্শকদের মুগ্ধ করে, সন্দেহ নেই।

**নিশাত বাগ**—শালিমার বাগের দু-মাইল দক্ষিণে নিশাতবাগ। বেগম নুরজাহানের ভাই আশফ জাহ ১০৪৪ হিজরি সনে এর ভিত্তিস্থাপন করেন। শালিমার বাগের মতো এখানেও পাহাড়ের গায়ে ধাপ তৈরি করে এই উদ্যান নির্মিত হয়েছে। এখানেও সুন্দর মখমলের মতো তৃণভূমি, সুন্দর জলের ফোয়ারা আর চিনারের ছায়া মেলে। তবে এটিকে সর্বাংশে শালিমার বাগের অনুকরণ বলা যায় না। এর ফোয়ারা আর নিকাশি নালার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য আছে। নিশাত বাগ পাঁচশো পচানব্বই গজ লম্বা এবং তিনশো ষাট গজ চওড়া। এর চারদিকেও প্রাচীরে ঘেরা। রবিবারে এখানেও দর্শনার্থীদের বেশ ভিড় হয়। ঘাসের গালিচায় সামোভার নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা চায়ের আসর বসায়।

**চশমাশাহী**—নিশাত বাগের আড়াই মাইল দক্ষিণে চশমাশাহী বর্ণা। এর জলের বিশুদ্ধতার কথা প্রসিদ্ধ। এর চারদিকেও বাগানের মতো আছে যা তৈরি করেছিলেন বাদশাহ শাহজাহান।

**দামপুর**—শ্রীনগর থেকে ন-মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত এই গ্রাম। এর চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত জাফরানের খেত বিস্তৃত। জাফরানের কেয়ারি খুব ছোট হয় (দেড়গজ + একগজ) যার কিনারায় একফুট গভীরতায় নালা কাটা থাকে। জুন মাসে জাফরান বোনা হয় এবং অক্টোবরের শেষে ফসল তোলা হয়। জাফরান গাছ দেখতে গমের গাছের মতো। এর ফুলের মাঝখানের কেশরগুলোই জাফরান। কাশ্মীরের মধ্যে একমাত্র এই অঞ্চলেই জাফরান জন্মায়। অন্যত্র চেষ্টা করে দেখা গেছে কিন্তু বিফল হতে হয়েছে। এই গ্রামের প্রাচীন নাম পদ্মপুর। বিষ্ণুপদ স্বামীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানেই রয়েছে। সেই মন্দিরের কিছু উঁচু উঁচু স্তম্ভ স্থানীয় কোনো এক মীর মুহাম্মদ রমদানীর জিয়ারতে লেগে গেছে।

**অবন্তীপুর**—একে বন্তীপুরও বলা হয়। গ্রামের কাছে অবন্তী বর্মার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে। ঝিলমের তীরে অবস্থিত এই মন্দির এক সময় অনেক মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়। এখনও বড় বড় পাথরের তৈরি দেয়াল, দরজা অর্ধ ভগ্ন মূর্তিরাশি এবং তার ওপরে উৎকীর্ণ কারুকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের চারদিক পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এর ভেতরে সুন্দর সুন্দর স্তম্ভের সারি দেখে মনে হয় এগুলো তখন কুঠুরি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এই স্তম্ভের মধ্যখানে ছিল মন্দিরের অবস্থান।

### জোজিলা অতিক্রম

শ্রীনগর থেকে লাদাখ যাবার দুটো রাস্তা আছে। এর মধ্যে যেটা বহুল ব্যবহৃত সে রাস্তাটা হলো জোজিলা গিরিপথ হয়ে। শ্রীনগর থেকে জোজিলার দূরত্ব দুশো চল্লিশ মাইল। সমতলের লোকের কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার দুশো চোদ্দ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত শ্রীনগরের ঠান্ডাই অসহ্য মনে হয় সেখানে জোজিলা অঞ্চলের ঠান্ডা কিরকম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সেজন্য ওপথের যাত্রীদের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। শ্রীনগর থেকেই গরম কোট, পাজামা, মোজা, হোস, কানঢাকা টুপি, দস্তানা, মাফলার, বিছানা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে নিতে হয়। শ্রীনগর থেকে টাঙা অথবা নৌকা যোগে গান্ধর্বল; এই সাড়ে ন'মাইল পথের উচ্চতা শ্রীনগর থেকে দুশো কুড়ি ফিট। শ্রীনগর থেকে গিলগিট যেতে হলেও গান্ধর্বল পর্যন্ত আসতে হয়। গান্ধর্বল থেকে কংগন (সাড়ে দশ মাইল), প্রথম ছাউনি বা বিশ্রামস্থল। লাদাখ যেহেতু একটি সীমান্ত জেলা এবং পূর্ব দিকে তার সীমানা তিব্বত ও উত্তরে চিনা তুর্কিস্তানের লাগোয়া, সে জন্য এই পথে যেতে শ্রীনগরের বৃটিশ জয়েন্ট কমিশনারের কাছ থেকে অনুমতি পত্র নিতে হয়। কংগনে সেই অনুমতি পত্র দেখা হয়, তারপরই আগে যেতে দেওয়া হয়। গান্ধর্বল থেকেই রাস্তা পাহাড়ের সঙ্গে নেয়, তবে চড়াই উতরাই বেশি নেই। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম রয়েছে, আর তার চারদিকে রয়েছে প্রচুর অখরোট, বাদাম, তুঁত ইত্যাদি গাছ। কাশ্মীরের লোক মূলত অন্নভোজী। মে মাসের অস্তিম সপ্তাহের মধ্যে খেত তৈরি হয়ে যায়। এখানেও দেখলাম ধানের চারা রোয়ার তোড়জোর চলছে।

গান্ধর্বল থেকে লাদাখ যাওয়ার রাস্তা সিন্ধুর ধার ঘেঁসে গিয়েছে। সিন্ধুর বাঁ-দিকের পাহাড়গুলো, গান্ধর্বল থেকে আরম্ভ করে বালতাল পর্যন্ত নানা ধরনের গাছগাছালিতে ভর্তি। কিন্তু ডান দিকের পাহাড়গুলোতে কোনো গাছ ইত্যাদি নেই। তবে এদিকটাতে গ্রাম এবং চাষের খেত আছে, আর গ্রামের মধ্যে কিছু আখরোট, বাদাম, খোবানির গাছ আছে। এদিকটাতে জলের কোনো অভাব নেই। খেতগুলোতে লাঙল চালিয়ে, মাটির ছোট বড় ঢেলা ভেঙে ধান রোয়ার প্রস্তুতি চলছে। যারা খেতে কাজ করছে তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। চাষ-আবাদের কাজ প্রায় সমস্তটাই কাশ্মীরী মুসলমানদের। পথে গুন্ড, কুলন আর সোনমার্গে কয়েকটা দোকান পেয়েছিলাম, যার মালিক হিন্দু। তারা কাশ্মীরী হিন্দুও হতে পারে অথবা পাঞ্জাবী। কংগন থেকে একটু একটু করে পথের উচ্চতা বাড়তে থাকে। কংগন থেকে মাত্র তেরো মাইল দূরে গুন্ডের উচ্চতা ছ-হাজার আটশো কুড়ি ফিট। আবার এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে সোনমার্গের উচ্চতা ন-হাজার চারশো ফিট। তবে এই চড়াই এতটা বিস্তৃত জায়গা নিয়ে ধীরে ধীরে উঠেছে যে যাত্রীদের উঠতে বিশেষ কোনো কষ্ট হয় না। রাস্তা বেশ ভালো, জায়গায় জায়গায় পুল রয়েছে। পাহাড়ের নিচের দিকে গুন্ড পর্যন্ত ধানচাষ হয়। এ দিককার মাটি বছরের বেশ কয়েকমাস বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মের শেষে এখানে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়। সোনমার্গে আমরা পৌঁছানর পর থেকেই বরফ পড়া শুরু হয়ে গেলো এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চারদিকে বেশ কয়েক ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ জমে গেলো। বরফ পড়ার দৃশ্য দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। বড় বড় ফোঁটায় কিংবা পেঁজা তুলোর মতো অবিরাম ঝরতে থাকে। স্থানীয় লোকেরা বলল— এখন গ্রীষ্মের মরসুম তাই তুষারপাতের প্রথম ভাগটা মাটি শুষে নিয়েছে না হলে মাটির মধ্যে পেঁজা তুলোর স্থূপ দেখতে পেতেন।



বালতালে ডাকবাংলো এবং সরাইখানা অথবা ধর্মশালা আছে। সোনমার্গ থেকে বালতালের পথে অনেক জায়গায় বরফ জমে ছিল। যাত্রীরা বরফের ওপর দিয়েই হাঁটছিল। কোথাও কোথাও সিন্ধু নদের জল জমে বরফ হয়ে পায়ে হেঁটে পারাপার করার মতো সাঁকো তৈরি হয়ে গেছে। বালতালে কোনো দোকান অথবা বসতি নেই। নিচের দিকে একটা গ্রাম আছে যেখানে বালতিদের (ভেরহো) বাস। কাশ্মীরীদের পক্ষে এরকম ঠান্ডাতে চাষ আবাদ করা খুবই কষ্টের।

বর্ষার সময় সোনমার্গ থেকে বালতালে যাবার পথটি আর সুগম থাকে না। তখন হামেশাই আশপাশের পাহাড় থেকে ধস নামে, পাথর গড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টিতে পাহাড়ের মাটি গলে ধুয়ে যায়, যার ফলে সেখানকার পাথরও আলগা হয়ে যায়। পাহাড় থেকে পাথর গড়ানোর দৃশ্য দেখলে মনে হয় কোনো ক্রুদ্ধ দানব বাহিনী ওপর থেকে পাথর বৃষ্টি করছে। বালতাল থেকে এক কাশ্মীরীকে একটা খোঁড়া ঘোড়া নিয়ে যেতে দেখলাম। ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে বেচারার ঘোড়ার পায়ে এতজোরে আঘাত করেছে যে মনে হয় ওর পা ভেঙে গেছে। বেচারার ঘোড়ার তো পা ভাঙার যন্ত্রণা ছিলই কিন্তু তার মালিককে দেখে মনে হচ্ছিল যে তার মাথায় বিপত্তির পাহাড় ভেঙে পড়েছে। আর হবেই বা না কেন, এই ঘোড়াই হয়তো তার জীবিকার একমাত্র সাধন।

বালতাল থেকে জোজিলা পার হবার দুটো রাস্তা আছে। একটা রাস্তা শীত কালের জন্য আরেকটা গ্রীষ্মকালের জন্য। গ্রীষ্মকালের রাস্তাটি সম্প্রতি খুলেছে। মাত্র দু-এক মাইল বরফমুক্ত পথ পাওয়া যাবে। তারপর আবার যে কে সেই। বরফের ওপর দিয়েই হাঁটতে হবে। বালতালের নিচ থেকেই চির বা পাইনের অরণ্য শেষ হয়ে গেছে। এখন জংলি সফেদা, বিরির সঙ্গে কিছু কিছু ভূর্জগাছও দেখা যায়। এগারো হাজার ফিট ওপরে যেখানে এখনও বেশ কয়েকমাস বরফ জমে থাকবে, সেরকম অঞ্চলেও এই পত্রশূন্য গাছ পরম সন্তোষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে বরফ নেই সেখানে গাছগুলোতে জামের মতো ছোট ছোট পাতা বের হয়েছে। চার মাইল চড়াই ভাঙার পর পাহাড়ের ওপরের অংশে পৌঁছলাম। এখানে চারপাশে যেন শ্বেতপাথরের দেয়াল বিস্তৃত। সামনে রূপোর গালিচা বেছানো বিশাল এক অধিত্যকা যার মাঝখানে মানুষ আর ঘোড়ার পদচিহ্ন এক পথের সৃষ্টি করছে। রোদ উঠলে খালি চোখে আর এই বরফের দিকে তাকানো যাবে না। তাকালে চোখে যন্ত্রণা হবে এমনকী চিরতরে চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়াও আশ্চর্যের নয়। যাত্রীরা চোখে রঙিন চশমা পরে পথ চলে। দরিদ্র অথবা স্থানীয় যাত্রী, যাদের চশমা জোটানোর সাধ্য নেই তারা ঘণ্টা খানেক এই পথে হাঁটলেই চোখে যন্ত্রণা অনুভব করে। চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কয়েকমাইল চলার পর জোজিলার জলবিভাজিকা এল। এই জল বিভাজিকার একদিকের জল গিয়ে পড়েছে সিন্ধুতে, আরেকটি পড়েছে গুন্ডের নদীতে। আরও ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর পৌঁছলাম মিচেইতে।

মিচেই-এর চার পাশেও জোজিলার মতোই বরফ দেখলাম। এই জায়গার উচ্চতাও এগারো হাজার ফিটের কম হবে না। মিচেই কোনো গ্রাম নয়। এখানেও ছোট একটি ডাকবাংলো এবং একটি সরাইখানা আছে। সরাইটি পুরানো টেলিগ্রাফ অফিসের বাড়িতে রয়েছে আর নতুন একটি বাড়িতে টেলিগ্রাফ অফিস পরিবর্তিত হয়েছে। মনে হলো না যে এই টেলিগ্রাফ অফিসের কোনো কাজ আছে। শ্রীনগর থেকে লাদাখ পর্যন্ত রাস্তায় কিছু দূরে দূরে ডাকবাংলো আছে যেখানে বালতাল পর্যন্ত যাত্রীদের রাত্রিবাসের জন্য দিতে হয় আট আনা এবং তা থেকে দূরের যাত্রীদের

দিতে হয় একটাকা। তবে সরাইতে রাত্রিবাসের জন্য কিছু দিতে হয় না এবং সরাইয়ের অবস্থাও বেশ ভালোই বলতে হবে। এই ছাউনিগুলোতে চৌকিদারের কাছে কাঠ এবং পশুখাদ্যের যোগান থাকে। ছাউনি থেকে একটু দূরেই গুন্ডের নদী বয়ে চলেছে। ভাষা এবং ভৌগোলিক দিক থেকে জোজিলা জল বিভাজিকাতেই কাশ্মীরের শেষ। এর পর শুরু হয় বালতিস্তান প্রদেশের।

মিচোই থেকে খানিক এগিয়ে ভটায়ন (১১০০০ ফিট)। মে মাসের শেষ পর্যন্ত এখানে বরফ জমে থাকে, জায়গাটা প্রচণ্ড ঠান্ডা। দিনের বেলা ছাড়া এখান দিয়ে প্রবাহিত সমস্ত নদী, নালা, বর্নার জল রাত্রিতে জমে বরফ হয়ে যায়। ছোট ছোট গর্তে জমে থাকা জলের ওপরে বরফের পাতলা আস্তরণ সামান্য পায়ের আঘাতেই কাঁচের মতো ভেঙে যায়। গ্রমের দিনে গলে যাবে না এমন সত্রে এই ভাঙা টুকরোগুলোকে অনায়াসে কাঁচের বদলে বাড়ির জানালায় বসিয়ে দেওয়া যায়।

ছোট ছোট জলস্রোতগুলোর কিনারার দিকে গতকাল আমি কিছু কিছু জায়গায় বালি দেখেছিলাম। এখন সেই বালি আর বরফ মিলে এমন শক্ত কংক্রীটের রূপ ধারণ করেছে যে তার মধ্যে থেকে কোনো কিছুকে বার করে আনতে হলে অনেক কসরত করতে হবে। জায়গায় জায়গায় পর্বত শৃঙ্গ থেকে গড়িয়ে আসা ‘মানি’ জমে রয়েছে। ‘মানি’ শব্দটা মনে হয় সংস্কৃত হিমালী শব্দের কাশ্মীরী রূপ। সাতদিন আগের ঘটনা, মিচোই থেকে একটু ওপরের দিকে চড়াইয়ের পথে এরকমই কিছু ‘মানি’ গড়িয়ে এসে তিনজন লোক এবং তিনটি ঘোড়াকে বলি হিসাবে নিয়েছে। একটি ঘোড়া পা খোঁড়া হয়ে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচেছে। এই ‘মানি’গুলো সত্যিই ভয়ের বস্তু। চলতে চলতে না জানি কখন কয়েক লক্ষ মন ‘মানি’ পর্বত থেকে গড়িয়ে যাত্রীদের ওপরে পড়ে তাদের বরফের মধ্যে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো যতটা সম্ভব সকাল সকাল, অন্তত সকাল নটা-দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়া উচিত। ওই সময় বরফ কিছু শক্ত থাকে। কিন্তু বিষয়ী মানুষ সব সময় অত সময় মেপে চলতে পারে না, তখন তাদের কেউ কেউ পর্বতের বলি হিসেবে গৃহীত হয়ে যায়। যদিও এরকম চরম ঘটনা আকছার ঘটে না।

ভটায়ন একটা ছোট গ্রাম। জোজিলার ওপারে যেমন নানা ধরনের গাছপালাতে ভর্তি তেমনি এপার একেবারে গাছপালা শূন্য। বনস্পতি বলতে শুধুই ঘাস এখানে পাওয়া যায়।

যে সব জায়গার বরফ গলে গিয়েছে সেখানে এর মধ্যেই সবুজের চিহ্ন ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে। এখনও কিছুদিন মানুষ আর পশু, উভয়কেই কষ্ট সহ্য করতে হবে। এদিকে একেবারেই গাছপালা না থাকায় জ্বালানি কাঠের খুবই অভাব। গোবর, ছাগল ভেড়ার নাদি এ সমস্তকেই শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। এখানকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যেন কখনও স্নান না করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। অবশ্য এরকম প্রচণ্ড ঠান্ডায় কিই-বা করবে। পরনের পোশাক সবই পশমের তৈরি। কারও কারও গায়ে ছাগল অথবা ভেড়ার চামড়াও রয়েছে। স্ত্রীলোকের পোশাক গায়ে লম্বা পশমি চোগা, পায়ে পশম আর চামড়ার মিশ্রণে তৈরি লম্বা জুতো এখানে যার নাম পম্পু, মাথায় থলের মতো একটা কানটুপি। কোমরে কোমরবন্ধ। ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়ির দেয়াল। দূর থেকে দেখে কোনটা বাড়ি আর কোনটা পাথরের স্তূপ, ঠাণ্ডা করা যায় না। এই পাথর আর বরফের রাজ্যে কঠোর প্রকৃতিদেবী এদের জন্য কি সাজিয়ে রেখেছে, যার জন্য এরা এখনও এখানে ধুনি জ্বলে বসে আছে? উৎপাদন বলতে তো বরফ গলে গেলে

পাঁচ-ছমাস ছাগল ভেড়া চড়িয়ে সেখান থেকে কিছু দুধ, মাংস চামড়া, আর কোথাও কোনো খেতে নিকৃষ্ট জাতের শস্য ক্রম্ব কিংবা গ্রিম জন্মে গেলে তো কথাই নেই, সমুদ্র কাছ হয়ে যায়। সমুদ্র আর চা এ দুটোই এখানকার প্রধান আহাৰ্য এবং পানীয়।

ভটায়ন ছেড়ে একবার নিচে একবার ওপরে করতে করতে গুপ্তেশ্বর নদীর তট ধরে দ্রাসের দিকে চলে যেতে হয়। এদিককার পাহাড়গুলো শুধুই পাথরে ভর্তি কোনো গাছপালার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। পাহাড়ে গাছপালা না থাকায় পাথরগুলো জোরে বাতাস বইলে কিংবা বৃষ্টি হলে বিনা বাধায় গড়িয়ে পড়তে থাকে, তার ফলে এই রাস্তায় চলতে গিয়ে অনেক সময়েই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়।

দ্রাস—(১০১৪৪ ফিট — সাড়ে বারো মাইল)—এই জায়গাটা গুপ্তেশ্বর এবং দ্রাস নদীর মিলনস্থলের একটু ওপরে। পাহাড় এখানেও মূলত নগ্ন এবং যার ওপরের দিক এখনও হিমাচ্ছাদিত। গমের খেতে সদ্য সদ্য চারা রোয়া হয়েছে। মেয়েরা খেতে কাজ করছে। এখানে খেত চাষ করতে বলদের বদলে চোমো ব্যবহার করা হয়। চোমো হলো পুরুষ ইয়াক বা চমরীর সঙ্গে গাভীর সংযোগে জন্মানো প্রাণী। এরা বলদের চেয়েও অনেক শক্ত পোক্ত এবং বেশি শীত সহ্যে পারে। বেশিরভাগ চোমেই দেখলাম কালো রঙের। এদের পিঠে কুঁজ হয় না, এবং ঘাড় ও লেজ বেশ লোমশ ও দীর্ঘ। এখানে গম ছাড়া ক্রম্ব নামে এক ধরনের শস্য জন্মায় যা দিয়ে এরা সমুদ্র তৈরি করে। কাশ্মীর এবং লাদাখ একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি প্রথমটিকে উদ্যান এবং বৃক্ষ বনস্পতির স্বর্গরাজ্য বলা যায় তাহলে দ্বিতীয়টিকে গাছপালা শূন্য নগ্ন পাহাড়ের শীতল এক নরক বলা যায়। আমি বারবার ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও এখানকার লোক কি করে জীবনযাপন করে? এরা নিজেদের ঘোড়া দিয়ে শ্রীনগর লাদাখের মধ্যে মালপত্র আনা নেওয়া করে। খাবার জন্য মক্কাই এরা কাশ্মীর থেকে আনে। যদিও প্রকৃতি সাধারণভাবে এই অঞ্চলের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর তা সত্ত্বেও যদি এখানকার অধিবাসীরা কিছু বুদ্ধি খরচ করে কাজ কর্ম করত তাহলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা কিছুটা অন্তত কম মনে হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— তারা এখানে সফেদা, বিরি ইত্যাদি গাছ লাগাতে পারত। রাজ্যের তরফ থেকে এ ধরনের কিছু গাছ পুঁতে দেখানোও হয়েছে। এর ফলে বাড়ি তৈরির প্রয়োজনীয় কাঠ স্থানীয়ভাবেই পেতে পারত এবং শীতে জ্বালানি হিসাবেও পেত। এখন এদের প্রচুর কষ্ট সহ্য করে জ্বালানি কাঠ যোগাড় করতে হয়।

দ্রাস থেকে একটা পথ গেছে জাংস্করের দিকে, আরেকটি লাদাখের দিকে। ব্যবসায়ীদের মালপত্র আনা এবং পাঠানোর জন্য এখানে মালগুদাম আছে। সরকারের তরফ থেকে মাল বইবার জন্য প্রতি মাইলে মজুরি কুলিদের দু-পয়সা এবং ঘোড়ার ক্ষেত্রে এক আনা নির্ধারিত আছে। এই অভাগা উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে ওই কুলিগিরিই এক পরম প্রাপ্তি। দ্রাসে ডাকঘর, তারঘর, একটি উর্দু প্রাইমারি স্কুল এবং একটি ডাকবাংলো আছে। নদীর ওপরে কাঁচা ইটের তৈরি একটা কেল্লাও দেখা যায়, যার কয়েকটি দেয়াল এখনও খাড়া রয়েছে। কেল্লার চারদিকে পরিখা আছে, কোনো এক সময় সেখানে জল ভরা থাকত। দ্রাস উপত্যকায় একজনও হিন্দু নেই কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির অনেক প্রাচীন চিহ্ন এখানে বর্তমান। দ্রাস থেকে লাদাখের পথে মাইল খানেক চড়াই ভাঙার পর একটা সমতল ভূমি পাওয়া যায় সেখানে অন্য অনেক পাথরের সঙ্গে একটা বড়

পাথরকে খেতের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখলাম। তার গায়ে উৎকীর্ণ সুন্দর চিত্র দেখে বুঝলাম এটি কোনো মন্দিরের স্তম্ভ ছিল। তবে এ নিয়ে আমাকে বেশি ভাবতে হয়নি, কারণ আরও একটু এগোতেই রাস্তার অন্যদিকে ওরকম কয়েকটি পাথরকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেলাম। বস্তুত ওখানে কোনো হিন্দু মন্দিরের দ্বারস্তম্ভ ছিল। এখনও সেখানে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানবাকৃতির দ্বারপালের মূর্তি রয়েছে। এই হতভাগ্য মন্দিরের প্রতি ভাগ্যের কঠোর হাত কি লিখন লিখেছিল তা এই ভগ্নস্তুপের মধ্যে দাঁড়ানো দ্বারপালের মূর্তিই বলে দিচ্ছিল।

আগেই বলেছি যে জোজিলা পার হবার পর যে অঞ্চল আরম্ভ হয়েছে তার সঙ্গে কাশ্মীরের কোনোই মিল নেই। এটা মূলত বালতিস্তান প্রদেশ। এদের চেহারা এবং ভাষা দুটোর সঙ্গেই তিব্বতীদের অনেক মিল রয়েছে। বালতিদের বাদ দিলে দ্রাস-এর আশপাশের গ্রামে দর্দ জাতির লোকেরাও বাস করে। এদের আদি নিবাস গিলগিট অঞ্চলে। যাকে দর্দস্তান বলা হয়। কে জানে কবে থেকে এরা এখানে এসে বাস করা আরম্ভ করেছে। এদের চেহারার মধ্যে মঙ্গোলিয়ান ছাপ স্পষ্ট কিন্তু এদের ভাষার সঙ্গে আর্য ভাষার অনেক মিল লক্ষ করা যায়। দু-একটা নমুনা দিচ্ছি—

সংস্কৃত	দর্দ	সংস্কৃত	দর্দ
অশ্ব	অস্প	অজা	অযি
গো	গাব	শ্বণ্	শুণ্ড
গোধূম	গম	কর্ণ	কণ্
পাদ	পা	হস্ত	হর্থ
বালক	বাল	অষ্টৌ	অষ্ট

এখানকার অর্থাৎ দর্দস্তানের সব অধিবাসীরাই সুন্নি মুসলমান।

দ্রাস থেকে শিমসখর্বু একুশ মাইল। রাস্তা যে খুব কঠিন তা নয় কিন্তু ভীষণ এবড়ো খেবড়ো। এদিককার পাহাড়ে ধস নামা পাথরের পরিমাণ বেশি। তবে যাত্রীদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কারণ এদিকে জোজিলার ওপারের মতো বৃষ্টি হয় না। পনেরো মাইল চলার পর এল সগ্রাম। এখানকার বসবাসকারীরা দর্দ (ব্রোকপা) জাতির লোক। এখানকার সমস্ত স্ত্রী পুরুষের পিঠেই পশমি কাপড়ের অতিরিক্ত একটা মেঘ বা ছাগলের চামড়া ঝুলছে। যব ও গমের চাষ এদিকটায় ভালোই হয় তবে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। এই অল্প জমিকেও সরস করার জন্য দূরদূরান্ত থেকে নালা কেটে জল আনা হয়েছে। এর জন্য তারা কোনো সরকারি সাহায্য পায় না। ঠসগ্রামের চারদিকে লোহাপাথরে ভর্তি। আমি রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা লাল রঙের পাথর তুলে দেখছিলাম, পরে জানলাম ওটা আমার খনিজ পাথর। প্রকৃতিদেবী একদিকে যেমন এ অঞ্চলকে বৃক্ষ বনস্পতি শূন্য করে শ্রীহীন করেছেন অন্যদিকে তেমনই দু-হাত উজাড় করে খনিজ সম্পদে ভরে দিয়েছেন। এখানে লোহা, তামা, সোনা প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলোকে যথাবিহিতভাবে নিষ্কাশনের কোনো উদ্যোগ এ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। লোকে সামান্য চাষবাস আর মালবাহকের কাজ করেই দিন গুজরান করে। এখান থেকে ট্রিটি (সন্ধি) রোড শুরু হয়ে মিচেই হয়ে পামির মালভূমির (চিনা তুর্কিস্তানের সীমানা) দিকে চলে গেছে। এই রাস্তা মেরামতির সমস্ত খরচ যোগাতে হয় রাজ্যকে কিন্তু পথের অধিকার সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ জয়েন্ট কমিশনারের। এই রাস্তার দু-ধারের সমস্ত ডাকবাংলোও তাঁরই অধিকারভুক্ত। শিমসখর্বুতে একটা

খুব ভালো ডাকবাংলো আছে। গ্রামের অবস্থান ডাকবাংলোর খানিকটা ওপরে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ গম আর যবের খেত দেখা যাচ্ছিল। আপেল, খোবানি প্রভৃতির গাছও স্থানীয় মানুষ কিছু কিছু লাগিয়েছে। লোকজনের বেশিরভাগই দর্দ। সেই পঁচিশ ঘর বসতির মধ্যে দু-ঘর সুনি এবং শেখ নুরবখ্স শিয়া।

### লাদাখ

কার্গিল থেকে সিঙ্কু তট—কার্গিল থেকে সিঙ্কুর তটভূমিতে যাবার একটা রাস্তা লালুডুংলা হয়ে গেছে। লা শব্দকে লাদাখী ভাষায় বলে গলিপথ। যেমন জোজিলা, ফোতলা ইত্যাদি। কার্গিল থেকে লালুডুংলার দূরত্ব এগারো মাইল এবং চড়াই রাস্তা। কার্গিলের উচ্চতা সমুদ্রতট থেকে যেখানে সাড়ে আট হাজার ফিট সেখানে লালুডুংলার উচ্চতা তেরো হাজার চারশো ফিট। জোজিলার পর থেকে গিরিপথে বরফ আর বিশেষ পাইনি। তবুও আশপাশের নালায় কিছু কিছু হিমশিলা পড়ে থাকতে দেখলাম। ‘লা’-এর কাছে পাহাড়ের উঁচু শিখরে এখনও বরফ আছে। এই সব পাহাড়ে প্রচুর চকোর পাখি দেখতে পেলাম। চকোরদের মধ্যে আবার যাদের আকার বড়, তাদের বলে রামচকোর। শীতের দিনে এদের ডাক বড় ঝিলের কাছে পানকৌড়ির ডাকের মতো শুনতে লাগে। সাধারণ চকোরের চাইতে রামচকোর অন্তত চারগুণ বড়। কিন্তু এগুলোকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে পালন করা সম্ভব নয়। আট হাজার ফিটের নিচে গেলেই এরা গরমে মরে যায়। যখন কার্গিলে মাত্র দু-এক ফাঁটা বৃষ্টিও হয় না (কারণ এই এলাকায় তুষারপাত ধরে বৃষ্টিপাতের হার মাত্র ন-ইঞ্চি) তখনও এখানে বরফ পড়ে। আমরা যখন এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখনও মটর দানার মতো বরফ পড়ছিল। লালুডুংলার দুপাশে অনেক দূর পর্যন্ত গ্রাম আছে। এখানে যব, গ্রিম আর সর্বের চাষ হয়। গাছের মধ্যে রয়েছে সফেদা আর বিরি। এ অঞ্চলে প্রচুর ছাগল ভেড়া দেখতে পেলাম। এদের চামড়া, লোম, দুধ এবং মাংস এখানকার লোকের প্রাণস্বরূপ বলা যায়।

গিরিপথ থেকে এক মাইল দূরে লালুডুং গ্রাম সমুদ্রতট থেকে বারো হাজার তিনশো ফিট ওপরে অবস্থিত। গ্রামটি বেশ সুন্দর বড়সড়। গ্রামের জনসংখ্যাও অনেক, প্রায় চল্লিশটি ঘর বাস করে এখানে। দুটো মসজিদ ও একটা জিয়ারত আছে। অধিবাসীরা কটুর শিয়াপন্থী। এবছর ঠান্ডা অনেকদিন পর্যন্ত থাকায় ফসল বুনতে দেরি হয়ে গেছে। গ্রামের নিচে প্রবাহিত নালায় এখনও ভাসমান হিমশিলা দেখা যায়। এই নালার ধারেই লালুডুংগের তিন মাইল নিচের গ্রাম সল্মো। সেখানেও শিয়া মুসলমানদের বসতি। নোংরা এবং অপরিচ্ছন্নতায় এরা পৃথিবীর মধ্যে অষ্টীয় বলে মনে হল। সমুদ্রতট থেকে এর উচ্চতা সাড়ে দশ হাজার ফিট। লালুডুংগে তেমনভাবে কোনো গাছ লালন-পালন করতে দেখিনি কিন্তু সল্মোতে দেখলাম খোবানি, সফেদা এবং বিরি প্রচুর লাগানো হয়েছে। গাছগুলোও যথেষ্ট সতেজ ও প্রাণবন্ত।

‘সনচে’ প্রথম বৌদ্ধ গ্রাম — সল্মো থেকে চার মাইল কঠিন চড়াই ভেঙে প্রথম বৌদ্ধ গ্রাম পাওয়া গেলো। বেশি দিন হয়নি, যখন এই সমগ্র অঞ্চলটাই বৌদ্ধপ্রধান ছিল। আজ তারা কমতে কমতে খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বারা আছে তাদেরও ভাবগতিক ভালো নয়। এই গ্রামটি গর্খুন এলাকার মধ্যে পড়ে। এদিককার পাঁচ-সাতটি গ্রামে এক বিশেষ জাতির লোক বাস করে। লাদাখীরা এদের ব্রোকপা (দর্দ) বলে। মুসলমান ব্রোকপা সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে যেখানে একজন মুসলমান ব্রোকপা বা দর্দ তার প্রাচীন ভাষাকে সাধ্য মতো জীবিত রেখেছে সেখানে এরা নিজেদের ভাষা ভুলে লাদাখী-তিব্বতী ভাষা বলে। অথচ এদের চেহারায় কোনো মঙ্গোলিয়ান ছাপ নেই, বরং আর্যদের সঙ্গেই বেশি মিল দেখা যায়। এরা গো-জাতিকে অত্যন্ত পুণ্যের দৃষ্টিতে দেখে। এই পুণ্যভাব এত অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছে গেছে যে এরা গোরুর দুধ মাখন কিছুই খায় না এবং সেজন্য এরা গো-পালনও করে না। এদের গ্রাম একেবারে গোরু আর কুকুর শূন্য। এদের বস্ত্রব্য গোরুর দুধ মাখন খেলে দেবতা নারাজ হন। একজন তো এমনও বলল—ওসব যে খায় সে তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

দার্চিল্ল সমুদ্রতট থেকে আঠারো হাজার পাঁচশো ফিট উচ্চতায় সিন্ধুর তটভূমিতে অবস্থিত। এখানে চল্লিশ ঘর বৌদ্ধ বসতি আছে। তবে হাল আমলে কিছু মুসলমানও এখানে বাস করছে। সমস্ত গর্খুন এলাকাতেই বৌদ্ধ মেয়েরা একই ধরনের পোশাক পরে। মাথার চুলে ছোট ছোট অনেকগুলো বিনুনী, গায়ে অর্ধেক হাতাওলা অত্যন্ত মলিন পশমি জামা, পায়ে সস্ত্রের আঁট হয়ে থাকা পশমি পাজামা। দু-হাতে পিতলের বালা, কাঁধে পিতলের দুই চক্র। এছাড়া এদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই কোমরবন্ধ ব্যবহার করে এবং সেখানে — চকমকির লোহা, পিতলের দুমুখো চামচ, ছোট একটা চিমটা ইত্যাদি জাতীয় কিছু আবশ্যকীয় জিনিস গৌজা থাকে।

গর্খুন (৮৯০০ ফিট)—চার মাইল এগিয়েই দর্দ জাতির অন্যতম মুখ্য গ্রাম গর্খুন। শোনা যায়, যখন দর্দস্তানের লোকজনকে জোর করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছিল, তখন কিছু লোক এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে আসে। এরা অবশ্য বলে তারা গিলগিট অঞ্চল থেকে এসেছে। এখানে ছাগলের দুধ আর তা থেকে তৈরি মাখন ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এরাও গাভীকে এতই পবিত্র মনে করে যে তাকে পালন করে না। এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিচিত্র এক প্রথা আছে। যখন কোনো পরিবারে ছেলের জন্ম হয়, তখন ছেলের বাবা ও মা ঘর থেকে বাইরে বেরোয় না। এমন কি শৌচ ক্রিয়াদিও ঘরের মধ্যেই সারে। পনেরো দিন থেকে একমাস পর্যন্ত এই স্বেচ্ছা বন্দিত্ব বলবৎ থাকে।

সমগ্র লাদাখে, পরিবারের মধ্যে শুধু বড় ভাইয়েরই বিয়ে করার অধিকার আছে। তবে এখানকার প্রথানুসারে বড় ভাইয়ের স্ত্রী অন্য ভাইদেরও স্ত্রী রূপে গণ্য হয়। সন্তান না জন্মালেও দ্বিতীয় বিয়ে করার বিধান নেই। পারিবারিক সম্পত্তির মালিকানাও শুধু বড় ভাই পেয়ে থাকে। এই প্রথা এদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে এক বিরাট অন্তরায়। শুধু তাই নয়, এর এক ভয়ংকর পরিণামের দিকও আছে। বালতিস্তানে মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। জায়গার অভাবে এরা বৌদ্ধপ্রধান গ্রামেও ঢুকে আসছে। বৌদ্ধরা তো যেমন ছিল তেমনই আছে কিন্তু এই নতুন প্রতিবেশীদের জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পরিণামে একদিন এই অঞ্চলেও বৌদ্ধরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে।

গর্খুনীয় বৌদ্ধদের মধ্যে সাবালক বয়সের আগে বিয়ে হয় না। দৈনন্দিন জীবনে তারা খুব অমোদপ্রিয়। নাচগান এরা খুব ভালোবাসে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই নানা প্রকারের ফুল দিয়ে টুপি সাজায়। গ্রামের মধ্যে কোনো বিশেষ একটা জায়গাতে নাচের আসর বসে। নাকাড়া, ব্যান্ডের মতো দেখতে ঢোল, সানাই, আর বাঁশি এই কটি বাদ্যযন্ত্র থাকে। প্রথমে শুধুই বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। এরপর আসে গানের পালা। প্রথমে মেয়েরা ছ-সাত জন মিলে কোরাস গায়, পরে ছেলেরা।

গানের কণ্ঠ, সুর খুবই শ্রুতিমধুর, বিশেষত মেয়েদের। গানের শেষ হলে অন্য বাজনা বন্ধ হয়ে যায়, একমাত্র নাকাড়া বাজতে থাকে। ডান হাতের মুষ্টি দিয়ে বাঁ-হাতে তিনবার আঘাত করে, তারপর হাত মুঠো করে মাথায় ঠেকায়। এটা কোনো অনুষ্ঠানের আগে বা পরে অভিবাদন জানানোর প্রথা। এরপর শুরু হয় নাচ। নাচের সময় যে কোনো একটি বাজনাই বাজানো হয়। হাতের বিভিন্ন মুদ্রাভঙ্গির সঙ্গে পায়ে তাল মিলিয়ে চলা, ব্যাস। নাচ বলতে ওটুকুই। মেয়েদের নাচের পর আসে পুরুষদের পালা। এসময় গানের বোল অত মিষ্টি লাগে না। পুরুষদের নাচে হাতের মুদ্রারও বিশেষ বৈচিত্র্য থাকে না, কারণ তারা অধিকাংশই ছঙ (ঘরে তৈরি মদ) পান করে মত্ত হয়ে আনন্দে নাচ করে। বৌদ্ধদের গ্রামে বাস করা মুসলমান মেয়েরাও তাদের খানিকটা স্বাভাবিক বজায় রেখে নাচে অংশ নেয়। গর্খুনে আমার দেখা নাচের আসরের ছটি মেয়ের মধ্যে তিনটি ছিল মুসলমান। মুসলমান মেয়েদের চেনা যায় তাদের টুপি দেখে। তাদের টুপির রঙ কালো হয় এবং সেখানে কোনো কারুকাজ থাকে না। তবে রংবেরঙের ফুল মুসলমান মেয়েরাও টুপিতে গোঁজে।

এদিককার মেয়েদের মধ্যে নাক ফুটো করার রেওয়াজ নেই। সকলের পিঠেই লোমশ ছাগল অথবা ভেড়ার চামড়া ঝুলছে। নাচের সময় মনে হয় ইন্দ্রসভার অঙ্গরারা এখানে এসে নাচ করছে। তাদের গানের একটি উদাহরণ—

য়ক্ রকর্ম জুস্মরি যক্। সর্বিনি যন্তত সার্বি যক্ ॥

(আজ মাথায় তারা আজ) (প্রকাশিত হচ্ছে আজ)

য়র্মে চোডাং গডং বিয়ক। চোডং, শুম্শুম্ সর্বি যক্ ॥

(পূর্ণ চন্দ্র শোভিত আজ) (তিন, তিনখানা চাঁদ শোভিত আজ)

দিচিডং ডিংতি ডংলম্পো জডং বো থোডং।

(আজ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছি সুন্দর)

দক্ - স্পোবো যম্বা থোডং।

(আমি আমার সুন্দর স্বামীকে দেখেছি)

মে অডংবো গ্যাংচিডং যম্বা থোডং।

(যে দেবতা অতি সুন্দর দেখেছি তাকে)

দক্-স্পোবো জডংবে মেছি স্ক্যুজুম্বা।

(আমার মতো সুন্দর স্বামী আসনে অসীন)

বু ডংরালা ছুম্বু ফুল ॥

(বালক বেশে আমি করজোড়ে দাঁড়িয়ে) ॥

গর্খুন থেকে পাঁচ মাইল দূরে দাহনালা। এই জায়গাটাই কার্গিল আর লাদাখ তহসিলের মধ্যবর্তী সীমানা। আবার অন্যভাবে বললে এটা মুসলমানপ্রধান প্রদেশ আর বৌদ্ধপ্রধান প্রদেশের মাঝখানের সীমানা। অন্য বৌদ্ধ এলাকার মতো দাহগ্রামেও কিছু মুসলমান এসে বসতি করেছে, যদিও তারা সংখ্যায এখনও খুব বেশি নয়। এখান থেকে দশ-বারো মাইল দূরে অচিনখঙ বলে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামের নিচের দিকে এক নালার তীরে কিছু আবাদ যোগ্য জমি আছে। তহসিলদারের পক্ষ থেকে সেই জমি মুসলমান ও বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যেই বন্ডোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানেরা সম্মো থেকে এখানে এসে বাস করছে। বৌদ্ধ এলাকার বেশিরভাগ জমিতেই

এধরনের বৈষম্যমূলক বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। ফলে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এই এলাকাও মুসলমান প্রধান প্রদেশে পরিণত হবে। কারণ মুসলমানেরা জমির প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী। ন্যায় বিচার সেটাই হতো যদি বৌদ্ধ এলাকার জমিতে একমাত্র বৌদ্ধদেরই বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। এমনিতেই বৌদ্ধদের 'বিশেষ' বিবাহ প্রথার জন্য তাদের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে না। অথচ চিরকাল তারা এদেশে অসংখ্য মানি আর স্তূপের সঙ্গে সহাবস্থান করে বাস করে আসছে। আজ সমগ্র পৃথিবীতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। বিদ্বজ্জনদের পৃথিবীর জনসংখ্যার বেপরোয়া বৃদ্ধিকে আগামী দিনের পক্ষে অশনি সংকেত বলে মনে করেন। অতঃপর যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণবিধিকে নিজেদের মধ্যে চালু করে দিয়েছে সেই লাদাখী বৌদ্ধদের তো কিছু পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না হয়ে, তাদের জমিতে বেহিসেবি সন্তানের জন্ম দেওয়া মুসলমান পরিবারদের নিয়ে গিয়ে বসানো হচ্ছে। অচিন-থঙ সমুদ্রতট থেকে ন-হাজার চারশো ফিট উঁচু। এখানে পাঁচ ঘর বৌদ্ধ ও এক ঘর মুসলমানের বাস। লালটুপি সম্প্রদায়ের এক লামার একটি গুম্ফাও এখানে আছে। গুম্ফার দেয়ালের ভিতরে আর বাইরে দুধরনের ছবি লাগানো রয়েছে। একদিকে রয়েছে সাত্ত্বিকভাবের ছবি, যেখানে বিভিন্ন মুদ্রায় ভগবান বুদ্ধকে পদ্মাসনে আসীন দেখানো হয়েছে। আরেক দিকে রয়েছে বামাচারি বীভৎসতার ছবি। এছাড়াও তারা, বোধিসত্ত্ব এবং অতিশার মাটির মূর্তি আছে। মূর্তিগুলো সুনির্মিত।

গ্রাম থেকে কখনও খুবই কাছে কখনও বা একটু দূরে অনেক বেদি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছোট বড় পাথর দিয়ে তৈরি, হাত তিনেকের মতো, বর্গাকারে থাকে। তার ওপরে আবার অনেক পাথর রাখা আছে যেগুলোর গায়ে তিব্বতী ভাষায় 'ওঁ মণিপদ্রে হুঁ' উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরলিপি খুবই সুন্দর যার মধ্য দিয়ে লামাদের কলা প্রীতির নিদর্শন মেলে। কোনো কোনো বেদি আবার বেশ বড় তার ওপরে পাথরও বেশি এবং সেগুলোর গায়ে নানা শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করা রয়েছে। পথ চলতে চলতে এধরনের শিলালেখ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোকে বৌদ্ধরা মানি বলে। মানিগুলোকে রাস্তার মাঝখানে রাখার কারণ এই যে পথ চলার সময় বৌদ্ধরা তাকে ডান দিকে রেখে চলবে এবং যাওয়া আসা ধরলে একটা পরিক্রমা সম্পূর্ণ হবে। ফলস্বরূপ যে মন্ত্র মানিতে লেখা আছে যাত্রীরা সেগুলো জপ না করেই জপ করার পুণ্য পেয়ে যাবে। এছাড়া গ্রামের আশপাশে অনেক স্তূপও দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপগুলি দেখতে অনেকটাই নালন্দা কিংবা বৌদ্ধগয়ার অনুরূপ যা মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। স্তূপের একেবারে উঁচু দিকে চিত্রপট অংকিত আছে।

**স্বয়ম্ভূতান**—অচিন-থঙ থেকে ন-মাইল দূরে সিঙ্কুনদের তীরে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম। গ্রামের নিচের দিকে বহুদূর পর্যন্ত গম ও যবের ফসল ভরা খেত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। খেতের মধ্যে সেচের জন্য সিঙ্কুনদ থেকে নালা কেটে জল আনা হয়েছে। চারদিকে অনেক খোবানি, আখরোট আর আপেলের গাছ। এর মধ্যে আখরোট গাছ আয়তনে ও ছায়া বিস্তারে সকলের চেয়ে এগিয়ে। গ্রামের মধ্যে কয়েকটি সুন্দর বাড়িও রয়েছে। বৌদ্ধদের বাড়ি-ঘর মুসলমানদের বাড়ি-ঘরের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্রামের কাছে পাহাড়ের ওপরে একটা গুম্ফা আছে। এই গুম্ফাটিও এই অঞ্চলের অন্যান্য গুহার মতো লামায়ুর গুম্ফার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই গুম্ফাতে ত্রিশ-চল্লিশ জন লামা থাকে এবং তাদের বসবাসের জন্য বেশ কয়েকটি ঘর আছে। তবে এখন গুম্ফায় বেশি লামা ছিল না, কারণ অনেকেই গেছে যুক গুম্ফাতে যে উৎসব চলছে,



তাতে যোগ দিতে। লামার সংখ্যা বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এখানকার বিবাহ প্রথা। এই প্রথানুযায়ী পরিবারের বড়ছেলেই একমাত্র বিয়ে করার অধিকারি, এবং পারিবারিক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারীও হয় সে। অন্যান্য ভাইয়েরা দাসের মতো থাকে এবং সর্বদাই তার মন যুগিয়ে চলতে হয়, না হলে বড়ভাই ইচ্ছে করলে তাকে পরিবার থেকে বার করে দিতে পারে। এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য অনেকে লামা হয়ে যায়। প্রত্যেক গুম্ফারই নিজস্ব জমি জায়গা আছে। একথা বলাও অতিশয়োক্তি হবে না যে লাদাখ অঞ্চলে অধিকাংশ আবাদী জমিই গুম্ফার অধিকারে। লামা নিজে অথবা কোনো গৃহস্থকে দিয়ে সেই জমি চাষ করায়। বস্তুত বেশভূষা বাদ দিলে একজন গৃহস্থ আর একজন লামার জীবনযাপনে খুব বেশি তফাত নেই। লামারাও চাষবাস, পথ চলাতি যাত্রীদের ঘোড়া, খচ্চরের জন্য ঘাস বিক্রি, ছাগল ভেড়ার বাগলি ইত্যাদি সব কাজই করে। উপরন্তু তাদের মাঝে মধ্যেই রাজকর্মচারীদের ব্যক্তিগত কাজে বেগার দিতে হয়। তাদের লাল পোশাকের কোনো মর্যাদাই সরকারি কর্মচারীরা দেয় না। পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম যারা পালন করছে তাদের এভাবে অবহেলা এবং অবমাননা করতে দেখে যে কোনো হিন্দুরই হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক যখন হিন্দু। যদি তারা মনে করে যে অনেক অনধিকারীও লামা হয়েছে, সেজন্যই এধরনের হেনস্থা তাহলে সেই অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা হতে পারে।

গুম্ফাতে পৌঁছাবার আগেই বেশ কিছু স্তূপ দেখতে পেলাম। ওখানে দুই ধরনের স্তূপ ছিল এক হলো ভক্ত তার ভক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে স্তূপ স্থাপনের মধ্য দিয়ে আর কিছু হলো কোনো স্বর্গীয় লামার দক্ষাবশিষ্ট অস্থির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। যাত্রীরা এগুলিকেও ডান দিকে রেখে পথ চলে। গুম্ফার চারদিকে ধাতব ফাঁপা বেলন লাগানো আছে। বেলনের মধ্যে ‘ওঁ মনিপদ্মে হুঁ’ লেখা কাগজ ভরা আছে। গুম্ফায় প্রবেশের আগে বা গুম্ফা থেকে বের হয়ে ভক্তরা ওই বেলনগুলিকে ঘোরায়। এর ফলে ওই বেলনের মধ্যকার মন্ত্র জপ করার পুণ্য অর্জিত হয়। এগুলোও এক ধরনের মানি। এদিককার গ্রামে কিংবা পথে ঘাটে কোথাও কুকুর দেখতে পেলাম না। প্রথম কুকুর দেখলাম স্বয়ংবুদ্ধান গুম্ফায়। ভয়ংকর কালো রঙের বিশাল কুকুরটি আমার সৌভাগ্য যে শিকলে বাঁধা ছিল। গুম্ফার মধ্যে দুটো মন্দির আছে, একটা সাদৃশ্যবোধের, যেখানে ভগবান বুদ্ধ (এখানকার লোক শাক্যমুনি বলে) তথা বোধিসত্ত্বের প্রতিমা আছে, কিছু ধাতব স্তূপও আছে। জুতো পরে মন্দিরে প্রবেশে কোনো বাধা নিষেধ নেই। আমি এজন্য তাদের কিছু বকাবকি করলাম। তারা বলল এটাই চলে আসছে। দ্বিতীয় মন্দিরে দেমছোগ (যবয়ুম)-এ বীভৎস অশ্লীল কামবাসনা উদ্ভেজক মূর্তি রয়েছে। মহাপ্রভু গৌতমের পবিত্র শিক্ষার কী হাল হয়েছে এদেশে। আজীবন যিনি ইন্দ্রিয় সংযমের উপদেশ দিয়েছেন, এখানে তাঁরই নামে কি বীভৎস কাণ্ড চলছে। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, মন্দিরের বাতাসও কলুষিত এবং অশ্লীলতায় পূর্ণ হয়ে গেছে।

**সিঙ্কুনদ**— দর্চক থেকেই আমরা সিঙ্কুর উজানের দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে চলতে আরম্ভ করেছিলাম। সিঙ্কুকে এখানে নীলকান্ত মণির ধার যেমন সে রকম দেখতে লাগে। শীতের দিনে মাঝখানের খরশোতা অঞ্চলটুকুকে বাদ দিলে, বাকি জায়গা এক থেকে ছয় ইঞ্চি পুরু বরফে পরিণত হয়। এই বরফ মালপত্র সহ ঘোড়া বা খচ্চরের ওজন সামলাতে পারে। বরফ আর শক্ত কাঁচ প্রায় একই ধর্মের। সিঙ্কুর ধারা কোথাও বেশ চওড়া আবার কোথাও বোতলের গলার মতো সরু। সিঙ্কুর দুপাশের পাহাড় নানা ধরনের খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে শুধু সোনা নিষ্কাশনের

কাজই হয়, তবে সেটাও খুব প্রাচীন পদ্ধতিতে। সোনা নিষ্কাশনের জন্য প্রতিটি লোককে মাসে বারো টাকা দিয়ে লাইসেন্স নিতে হয়। সিন্ধুতটের ওপরের ভাগ খুঁড়লে এক ধরনের বালি পাওয়া যায় সেই বালিকে ক্রমাগত ধুয়ে ধুয়ে সোনার কণা সংগ্রহ করা হয়। এখানকার পাহাড়ে কোথাও কোথাও কমলা এবং লাল রঙের মাটি পাওয়া যায়, যা থেকে বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করলে নানা রকমের রং তৈরি করতে পারেন। এ অঞ্চলের বেশিরভাগ পাহাড়ই গাছপালা শূন্য, ন্যাড়া তবে গ্রামের মধ্যে বেশ কিছু গাছপালা রয়েছে যেগুলো গ্রামের লোকের লাগানো। স্বয়ংবুদ্ধান থেকে পনেরো মাইল দূরে সিন্ধুর ওপারে সেই নালাটা আসে যার তটভূমি ধরে চলে গেছে বিখ্যাত ট্রিটি রোড। সিন্ধুর ওপরের ঝুলন্ত সেতু পার হয়ে দুটো রাস্তা এক হয়ে যায়। এরপর আশে বচড়া গ্রাম যেখানে খসসীদের বাস।

লামায়ুরু — ট্রিটি রোডের ওপরে অবস্থিত খলটি থেকে লামায়ুরুর দূরত্ব দশ মাইল। এখানে একটা সুন্দর এবং বড় গুম্ফা আছে। 'য়ুরু' বলতে স্বস্তিকা চিহ্নকে বোঝায়। সংক্ষেপে লোকে এই জায়গাটাকে যুরু বলে। কিন্তু যেহেতু এ অঞ্চলে লামাদের প্রভাব খুব বেশি, সেই কারণে এর নাম হয়েছে লামায়ুরু। লামায়ুরুর চারপাশে যত পাহাড় আছে সবই প্রধানত মাটির, পাথরের অংশ নেই বললেই চলে। গুম্ফাটি ওরকমই একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে এখানে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যার জন্য প্রায় একশো লামা জড়ো হয়েছিল। এখানে লামা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) এবং চোমো (সন্ন্যাসিনী) উভয়েই থাকে। চোমোরা অবশ্য গুম্ফার মধ্যে থাকে না, একটু দূরে তাদের থাকার জন্য আলাদা জায়গা আছে। লামাদের পোশাক নানা মাপের কাপড়ের টুকরো জুড়ে সেলাই করে এক আহমদ (আলখান্না জাতীয়) তৈরি করে, তার ওপরে থাকে হাত কাটা জ্যাকেট এবং তার ওপরে থাকে একটা রঙিন চাদর। সমস্ত পোশাকটি লাল রঙের হয়। তাছাড়া হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো এবং টুপি। তবে লামারা নিয়মিতভাবে টুপি পড়ে না, মাঝে মধ্যে পড়ে। তিব্বতী লামাদের মধ্যে দুটো ভাগ আছে, ওদের ভাষায় একদলকে বলে সের্পোগোন (হলুদ টুপি) এবং মার্পোগোন (লাল টুপি), উভয় গোষ্ঠীরই পোশাকের রং লাল, শুধু টুপি দু রকমের হলুদ আর লাল। তবে এদের আচার বিচারে বেশ পার্থক্য আছে। যেখানে সের্পোগোন অর্থাৎ হলুদ টুপিধারীরা ছঙ অর্থাৎ মদকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ মনে করে সেখানে মার্পোগোনেরা প্রকাশ্যে মঠে বসেই ছঙ পান করে। যে সমস্ত চোমোরা (সন্ন্যাসিনী) বিশেষ লেখাপড়া জানে তাদের পোশাক লামাদের মতোই হয়। বাকি চোমোদের পরিচ্ছদ একটা লম্বা ধরনের চোগা। লামা এবং চোমো উভয়েরই মাথা মুগুন করা থাকে। চোমোদের মধ্যে একজন প্রবীণা থাকেন, যার কাজ হলো চোমোদের কাজকর্মের দেখাশোনা করা এমনকী বেচাল দেখলে শাস্তি বিধান করা। আগেই বলেছি যে লাদাখের আবাদযোগ্য জমির বেশির ভাগটাই মঠের অধিকারে। চোমোরা মঠের খেতে খামারে লামাদের চেয়ে অনেক বেশি এবং ভালো কাজ করে। যে কারণে এ অঞ্চলে লামা হবার প্রবণতা বেশি, সেই একই কারণে চোমো হবার সংখ্যাও বেশি। পারিবারিক কারণে বড় ভাইয়ের একচ্ছত্র অধিকারের বাইরে এসে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য যেমন লামা হওয়ার প্রবণতা আছে তেমনই অনেক সময়ে বাবা মা পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষায় ছেলেকে মঠে দান করে, কিংবা সন্তান চিরস্থায়ী রুগ্ন হলেও মঠে দান করা হয়। পরে এরা সকলেই লামা হয়। আবার চোমোর আধিক্যের কারণও ওই পারিবারিক প্রথা। এখানে একই

পরিবারের দুটি, তিনটি এমনকী চারটি ভাইয়ের সঙ্গেও একটি মেয়েরই বিয়ে হয়। স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম হলেও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের নিয়ম নেই। এই নিয়মের ফলে বহু মেয়ের স্বামী জোটে না বা বিয়ে হয় না। এই সব বিয়ে না হওয়া মেয়েদের জন্য দুটো পথ খোলা থাকে, কেউ কেউ গুম্ফায় গিয়ে চোমো হয়, কেউ কেউ আবার ঘর সংসারের লোভে মুসলমানের ঘরে চলে যায়। বাবা মা মেয়েকে গুম্ফায় দান করেছে এমন ঘটনাও আছে।

লামায়ুরু গুম্ফা আবার পয়াঙের গুম্ফার অধীন। প্রধান গুম্ফার অধ্যক্ষকে কুশোক বলে। একজন কুশোকের মৃত্যু হলে কোনো সর্বজ্ঞ লামা জানাবে যে অমুক জায়গাতে নতুন কুশোক জন্মগ্রহণ করেছেন। কখনও কখনও একেবারে সুনিশ্চিত হবার জন্য লামার প্রধান দৈবজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হয়। এরপর যে বালকের সন্ধান পাওয়া যায়, তার বাবা মাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে লামারা ছেলেটিকে মঠে নিয়ে আসে। মঠের তত্ত্বাবধানে ছেলেটি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কুশোক ততদিন পর্যন্ত বড় হতে থাকে, যতদিন না সে সাবালক হয়ে মঠের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত হয়। এই মধ্যবর্তী সময়টা কুশোকের প্রতিনিধি হয়ে মঠের কোনো প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ লামা সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করে। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে সমস্ত কুশোকই লাদাখ অথবা তিব্বতে জন্ম নেন। কেউ তো ভারত বা অন্যত্রও জন্মাতে পারেন!

বোধ হয় কুশোক জন্মগ্রহণের স্থানের পরিধি আরও বাড়িয়ে দিলে তাকে খুঁজে বের করা অসুবিধাজনক হতে পারে এই ভেবে পরিধি সীমিত রাখা হয়েছে। লাদাখে বর্তমানে পাঁচজন অবতারি লামা বা কুশোক আছেন। তাঁদের পাঁচটি মঠ হলো— হেমিস্, পয়াঙ, রিজোঙ, টিক্সে আর পিতোক্। এদের মধ্যে প্রথম দুটি লাল টুপিধারী সম্প্রদায়। কিছুকাল আগে পিতোকের কুশোকের মৃত্যু হয়েছে। পরে সে এক রাজার ঘরে (বছরে হাজার, বারোশো টাকা আমদানি) দ্বিতীয় পুত্র হয়ে জন্মায়। এখন তার বয়স সাত-আট বছর, রিজোঙ-এর কুশোকের তত্ত্বাবধানে থেকে সে লেখাপড়া শিখছে। সমস্ত কুশোকদের মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চায় রিজোঙ গুম্ফা এগিয়ে আবার ভক্তি আরাধনার ক্ষেত্রে এগিয়ে পয়াঙ গুম্ফা। পিতোকের ভূতপূর্ব কুশোক বাকুলা একজন প্রকৃত জ্ঞানী, সমঝদার এবং উদ্যমী পুরুষ ছিলেন। আজও লোকে তাঁর কথা স্মরণ করে আফশোশ করে। তিনি ভক্ত মণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, দিল্লী দরবার এবং কাশী বারানসী দেখেছিলেন। পয়াঙের কুশোক অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির এক সজ্জন। যদিও তিনি তাঁর শাস্ত্র গ্রন্থগুলিকে একমাত্র তিব্বতী ভাষাতেই দেখেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে সংস্কৃত শেখার খুব আগ্রহ আছে। রিজোঙের কুশোক এমনিতে যথেষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু তিনি বিয়ে করেছেন এবং সেজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠাও কিছুটা কমে গিয়েছে। টিক্সের কুশোক এসেছিলেন লাসা থেকে। এখানে এসে তিনি তামাক, মদ ইত্যাদিতে ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। এবং তার ফলে মঠের বাকি লামারা তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। বিরোধিতা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে কুশোককে মঠ ছাড়তে হয়। লোকে বলে সে নাকি পরে খৃস্টান হয়ে যায়। তবে ঘটনা এই যে বর্তমানে সে লাসাতেই আছে। মঠ ছেড়ে চলে যাবার সময় সে একজন স্ত্রী লোককেও সঙ্গে নিয়েছিল। যাকে সে পথে দার্জিলিঙেই ছেড়ে যায়। হেমিস্ গুম্ফা বৈভবের দিক থেকে লাদাখের সব গুম্ফার চেয়ে এগিয়ে। এই গুম্ফার নগদ বার্ষিক আয় প্রায় পাঁচশ হাজার টাকা। অস্তুত বাজারে এরকম খবরই প্রচলিত। কিন্তু গল্পার (উৎপাদিত ফসল—গম, গ্রিম, যব ইত্যাদি) পরিমাণ প্রায় সত্তর আশি হাজার মণের মতো।

বাজারে যার দাম কম করে হলেও দু-তিন লক্ষ টাকা হওয়া উচিত। লাদাখের প্রায় সব গ্রামেই এই মঠের জমি আছে। কথিত আছে, লাদাখ যখন স্বাধীন ছিল তখন এখানকার রাজার দুই ছেলে ছিল। বড় ছেলে রাজত্ব পেল আর ছোট ছেলে পেল হেমিসের কুশোকের পদ। কুশোকের পদ পাওয়া মানেই রাজ্যের অর্ধেক পাওয়া। সন্তর-পাঁচাত্তর বছর আগে উজীর জোরাবর সিংহ যখন লাদাখকে কাশ্মীরের রাজার পক্ষ হয়ে জয় করেন তখন অন্য সমস্ত গুম্ফাই আক্রমণকারীদের বিরোধিতা করেছিল। ব্যতিক্রম ছিল শুধু হেমিস্। হেমিস্ বরং জোরাবর সিংহকে সর্বপ্রকার সহায়তা করেছিল। তিব্বত আক্রমণের সময়ও এই গুম্ফা থেকে প্রচুর রসদপত্র সাহায্য করা হয়েছিল। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ হেমিস্ গুম্ফার সমস্ত জায়গির যথাযথ বজায় থাকে। সমস্ত কাশ্মীরে জমির মালিক একমাত্র মহারাজা। কৃষক কেবল চাষ এবং বাস করার অধিকারী তবে প্রয়োজনে কৃষক এই অধিকার অন্যকে বিক্রিও করতে পারে। হেমিস্ গুম্ফার বেলাতেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

লামায়ুক্রর বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে এখানকার সামাজিক অবস্থা বোঝানোর জন্য ওটুকু প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। আগেই বলছি যে যুরু গুম্ফা পয়ান্ডের অধীন। লাল টুপিধারীরা একে ডিগুডং-পা বলে। অন্য গুম্ফার মতো এদের প্রধানতম মঠ লাসার কাছে অবস্থিত এবং সেই মঠের নাম ডিগুডং। সেখানে নাকি সাত হাজার লামার বাস। স্থানীয় বেশ কিছু লামা উচ্চশিক্ষার্থে লাসায় তাদের ওই প্রধান মঠে গিয়ে থাকে। তাদের দৈনন্দিন আহাৰ্য এবং অন্যান্য দায়িত্ব ওই প্রধান মঠই বহন করে। পরিবর্তে ওই মঠের কাফেলা বছরে একবার করে সম্পদ সংগ্রহের জন্য লাদাখে আসে তখন যেখানে যেখানে তাদের ছাউনি পড়ে তার কাছাকাছি তাদের শাখা মঠ থাকলে, কাফেলার ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদির দানাপানি যোগাতে হয়। যুরুতে কিছু লাসা ফেরত লামা আছে। লাসাতে এরা তিব্বতী ভাষাতেই বইপত্র পড়ে কেউ কেউ ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী চিত্রকারিতা শেখে।

মঠের লামারা দুই ধরনের হয়—নাগরিক এবং আরণ্যক। দুই দলের মধ্যে পার্থক্য এইটুকুই যে নাগরিক লামারা বড় বা ছোট গুম্ফায় থাকে সেখানে আরণ্যক লামারা পাহাড়ের একান্তে বাস করে। কোনো আরণ্যক লামার মাথায় নিয়মিত মুণ্ডনের অভাবে জটা দেখা যায়। এই একশো-দেড়শো লামার মধ্যে একজনকেই পেলাম যে ভাঙাভাঙা হিন্দী বলতে পারে এবং কিছু দেবতার সংস্কৃত নামও জানে। লামায়ুক্রর উৎসবের নাম ‘ছি-ছোন’ (ধর্মপুস্তক পাঠ) উৎসব। মন্দিরে সারিবদ্ধভাবে পঞ্চাশ জনের মতো বসার আসন পাতা। আসনের সামনে বই রাখা আছে। কোথাও কোথাও ধূপদানী রয়েছে। একদিকে ‘শাক্যথুবা’ (ভগবান বুদ্ধ) এবং মহাযান সম্প্রদায়ের অনেক বোধিসত্ত্ব অথবা দেবদেবীর মূর্তি। বাঁ-দিকের কোণে ছোট মন্দিরে মৈথুনরত দেম্ছোগ্যব-য়ুস সহ অন্যান্য বামমার্গী দেবতার মূর্তি আছে। মন্দিরের দেয়ালেও অনেক বোধিসত্ত্ব মূর্তি রয়েছে। শুধু বাঁ-দিকের দেয়ালে মূর্তিগুলি ঝট্ট দেবী দেবতাদের। এখানেও জুতো পরে মন্দিরে ঢোকায় কোনো নিষেধ নেই। এখানকার লোকের বক্তব্য—নগ্ন পদে যাওয়ার চেয়ে জুতো পরে যাওয়াটা অনেক শালীন ও শোভন। কারণ এদের পা অত্যন্ত নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত, কিন্তু জুতো পায়ের দেবী দেবতাদের সামনে যাবার সাহস অন্তত আমি দেখাতে পারলাম না। পথ চলতে চলতেই প্রায়শই মাখন আর নুন দেওয়া চা পান চলছিল। কেউ যখন পাঠে মগ্ন তখন তার পাশেই আরেক জন অন্যলোকের সঙ্গে গল্পই করে চলেছে। গুম্ফার ভেতরের বাতাস বেশ ভারি মনে হচ্ছিল। যদিও মন্দিরের ঠিক

মধ্যখানে একেবারে উঁচুতে, ছাদের কাছে একটা জানালা লাগানো রয়েছে। কিন্তু ওই রক্ত পথে এত আলো আসে না যাতে সমস্ত জায়গাটাই আলোকিত হতে পারে। ভেতরে আমার একটা পাত্রে তেল ভরা আছে। পাত্রটা মুখ খোলা, তার মুখের ঢাকনির গায়ে অনেক ছিদ্র আছে। পাত্রের ওপরে ঢাকনা চাপা দিয়ে, ঢাকনার ছিদ্রের ভেতর দিয়ে মোটা মোটা সলতে পাত্রের মধ্যের তেলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাস, হয়ে গেলো প্রদীপ। এই প্রদীপটি দিনরাত জ্বলে। প্রদীপের আলোকে তার কাছাকাছি জায়গাটুকুই কোনোক্রমে আলোকিত হয়। মন্দিরের ডানদিকে এবং বাঁ-দিকে, কাঠের আলমারিতে প্রচুর বই রয়েছে। অধিকাংশ বই ছাপা হয়েছে লাসাতে। অনেক বই দড়ির বেঁটনি দিয়ে বাঁধা, যেভাবে আমাদের দেশে পুঁথি বাঁধা হয়। কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বইও সেখানে দেখতে পেলাম। অধিকাংশ বইই ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কিত, ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’ কিংবা ‘বিনয়’ সম্বন্ধীয় বইও কয়েকখানা ছিল।

মন্দিরের বাইরে বাঁ-দিকে ষাট-সত্তর জন লোক বসতে পারে এমন একটা হলঘর আছে। হলঘরটির দেয়ালে নানা বর্ণে বিচিত্র চিত্রপট টাঙানো রয়েছে। হলঘরে প্রবেশের জন্য এককোণে একটা ছোট দরজা আছে। একটি দেয়ালে অনেক দেবদেবীর সৌম্য চিত্রপট, আরেকটিতে অনেক বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধ এবং অবতারী লামাদের ছবি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো ওই ধরনের ছবির মধ্যে একটি ছবিতে স্বয়ং বুদ্ধকেও ওরকম বাসনায় লিপ্ত দেখানো হয়েছে। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র জীবন আর বাণীকে এরা কোথা থেকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে। চতুর্থ দেয়ালেও অনেক দেবদেবীর ছবি, যাদের অনেকে আবার মরা মানুষের মাথার খুলিতে করে মদ পান করছে। মন্দিরের পিছনে এই ধরনের ছবি সাজানো আরও একটি হলঘর আছে। সেখানে এখানকার চেয়ে একটু বেশ আলো রয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখি ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই বেশ মৌজ করে ছুঁ পান করছে। দশ-বারো বছরের একটি ছেলেকে দেখলাম নেশায় চুর, কোনো হুঁশ নেই। বড় বড় তামা আর পিতলের পাত্রে অনবরত ছুঁ ঢালা হচ্ছে আর মুহূর্তের মধ্যে তা উধাও হয়ে যাচ্ছে, এই ছিল সেখানকার চিত্র। সেখান থেকে খানিক দূরে চোমোদের চক্র চলছিল। বাইরের দিকেও প্রচুর গ্রামবাসী এবং তাদের সঙ্গে দীন দরিদ্র ভিক্ষারিও আপন আপন পেয়ালা ভরে ছুঁ পান করে চলছিল। এখানকার রাজ সরকারের আবগারি বিভাগের পক্ষ থেকে ছুঁ তৈরিতে কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা নেই।

লামায়ুক গ্রামে তিরিশ চল্লিশ ঘর বৌদ্ধ বাস করে। এলাকার অধিকাংশ জমির মালিক মঠ। যা কিছু উৎপন্ন হয় তার সিংহভাগ যায় লামাদের কাছে। গ্রামবাসীদের পূজার খরচ, সরকারি রাজস্ব, চাষের ব্যয় ইত্যাদি হিসাবে মঠকে তার প্রাপ্য দিয়ে যা বাকি থাকে তাতে কোনোক্রমে মাস তিনেক চলে। বাকি ন-মাস মেহনত-মজদুরি করে, কন্ডল-কাপেট বুনো গুজরান করতে হয়। সমস্ত লাদাখে এই একই হাল। অন্যদিকে এই পরজীবী লামার দল গৃহস্থের পরিশ্রমের ফল নির্দায়ে ভোগ করছে। পরিবর্তে তারা গ্রামের লোকদের ছুঁ পানের কুঅভ্যাস ছাড়া, আর কিছুই দেয়নি। বৌদ্ধ মেয়েরা এখন মুসলমানদের বিয়ে করছে। এই গ্রামেও বৌদ্ধ মেয়ে বিয়ে করা একটি মুসলমান পরিবার বাস করছে। সেখানে মুসলমান স্বামীর ঔরসে বৌদ্ধ মেয়েটির কয়েকটি সন্তানও জন্মেছে। বৌদ্ধরা এর মধ্যে দোষের কিছু দেখে না, বরং খুশিই হয়। ওই বৌদ্ধ মেয়েটিও হয়তো সুখী। তারা

এখানে ছোট একটা দোকান দিয়েছে। মঠ আর গৃহস্থের জন্য মাংস কেটে যোগান দেয়। বৌদ্ধদের জীবহত্যা করা বারন। দশ বছর পর ওই একঘর মুসলমান পাঁচঘরে পরিণত হবে, এটা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। তাদের ছেলের এই গ্রামেই মেয়ে জুটে যাবে। যদি জন প্রতি চারটি করে সন্তান হয় তাহলে তিরিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে মুসলমান বসতের সংখ্যা কুড়ি পঁচিশ হয়ে যাবে, এবং এইভাবে হিসাব করলে নিশ্চিত দেখা যাবে যে আগামী অর্ধশতাব্দীর মধ্যে এই গ্রামটি মুসলমান প্রধান গ্রামে পরিবর্তিত হবে। কারণ বৌদ্ধরা পাঁচশো বছর আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমন আছে এবং আগামী পাঁচশো বছর পরেও ওরকমই থাকবে। বৌদ্ধদের পারিবারিক প্রথাই তাদের বাড়তে দেবে না, বরং কিছু কমে যেতে পারে। যদি না ইতিমধ্যে বিয়ে করা এবং পারিবারিক সম্পত্তি পাওয়ার একচেটিয়া অধিকার যা বড় ভাইয়ের আছে তার কিছু বদল না ঘটে।

সমস্ত লাদাখে বৌদ্ধরা এক ধরনের পোশাক পরে, ছেলেরা মাথার চুলে উল বা সুতোর বিনুনি গেঁথে কোমর অবধি টিকির মতো করে ঝুলিয়ে দেয়। মাথায় কান ঢাকা টুপি—সেটা পশমের, সুতির, কিংবা বাচ্চা ছাগল ভেড়ার নরম চামড়া দিয়ে তৈরি হয়। গায়ে গাঢ় লাল রঙের পশমি চোগা নিচে একই রঙের পাজামা। পশমের মোজা হাঁটু পর্যন্ত তোলা, পায়ে জুতো, কোমরে চওড়া কোমর বন্ধনী—যার মধ্যে চকমকি লোহার টুকরো, লোহার কলম রাখার কলমদান ও কলম এবং ছুরি গোঁজা থাকে। স্ত্রী লোকেরা লাল কিংবা কালো রঙের চোগা, কোমর বন্ধনী, পাজামা এবং জুতো পরে। মাথায় ভারি ফিরোজার অলংকার, লাল কাপড় জড়িয়ে সাপের ফণার আদলে তৈরি ‘পীরগ’ নামের একটা শিরোভূষণ পরে। এছাড়া কানের ওপরে ‘চরুকো’ নামের একটা আভূষণ পরে যেটাকে মাথার চুলে জড়িয়ে হাতির কানের মতো আকার দেওয়া হয়। দূর থেকে দেখলে চরুকোকে হাতির কান এবং পীরগকে হাতির শৃঁড় বলে ভুল হতে পারে। এছাড়াও মুগা প্রভৃতির মালা গলায় এবং দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট ছাগলের চামড়া প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পিঠেই ঝোলে। অনেকে হাতে শংখের বালাও পড়ে।

মুসলমান মেয়েদের পোশাক হলো লম্বা কুর্তা পাজামা, ওড়না আর জুতো। চামড়া এবং উল মিশিয়ে তৈরি এক ধরনের লম্বা গম্বু জুতো। ওড়নার চল হাল আমলে হয়েছে। পোশাকের রং অবশ্যই কালো কিন্তু ওড়নার রং পাকা গমের মতো। তবে স্নানটানের বালাই না থাকায় ওড়না নিয়মিত ধোয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। অতএব গোধূম বর্ণের ওড়না কিছুদিনের মধ্যেই কালো রঙের ওড়নাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। খেতে হাল দেওয়া এবং মাল নামানো ওঠানোর কাজ বাদ দিলে আর সব কাজই করে মেয়েরা। মুসলমান মেয়েদের মধ্যেও প্রচণ্ড ধর্মাত্মতা রয়েছে। নিজেদের গুরুকে—যাকে এরা বলে আগা—খুব মান্য করে। বালতিরা কার্গিল আর স্কর্দু এই দুই তহসিলে বাস করে। এদের মধ্যে কয়েকজন আগা আছে। এই আগাদের কেউ কেউ আবার ইরান থেকে পড়াশোনা করে এসেছে। এরা সকলেই শিয়াপন্থী মুসলমান। ‘মুতা’ নামের এক বিচিত্র প্রথা এদের মধ্যে প্রচলিত আছে যার সরল অর্থ ‘মেয়াদী বিবাহ’। মনে করুন আপনি একজন মুসলমান, কার্যোপলক্ষে এদেশে এসেছেন এবং মনে হচ্ছে একটি স্ত্রী থাকলে ভালো হতো, কিন্তু সেটি কোনোমতেই যেন সারা জীবনের জন্য ঘাড়ে চেপে না বসে। একরম অবস্থায় আপনি কোনো কুমারী অথবা বিধবা মেয়েকে প্রস্তাব করতে পারেন। সে প্রস্তাব মেনে নিলে মোল্লাকে ডাকা হবে।

মোল্লাকে কিছু দক্ষিণা দিতে হবে। মোল্লা দক্ষিণা পেলেই সেই যুবতীর সঙ্গে আপনার ইচ্ছেমতো—সেটা একটি রাত্রির জন্যও হতে পারে আবার দশ বছরের জন্যও হতে পারে—কিছু মোহর (স্বীধন)-এর কড়াড়ে মুতা পরিয়ে দেবে। মুতায় উল্লিখিত মেয়াদ পার হয়ে গেলে বিয়ে আপনা আপনিই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আগারা যখন তাদের শিষ্যদের এলাকায় ঘোরাঘুরি করে তখন সেখানকার দু-একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ের সঙ্গে দু-এক রাত্রির জন্য মুতার ব্যবস্থা করে নেয়। মুতার ফলে তারা যে শুধু ইহলোকেই সুখী হচ্ছে তাই নয়, আগারা তাদের মগজ ধোলাই করে বলে এই পবিত্র সম্পর্কের জোরে বেহেস্তে তাদের আসন একেবারে পাকা। পাঠকের এই প্রথা সম্বন্ধে সন্ধিহান হবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই প্রথা এখন ‘আম’ অর্থাৎ সর্বসাধারণের স্বীকৃত প্রথা হয়ে গেছে। কোনো কোনো আগা তো এমন ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে বিবাহিতা মেয়েদেরও অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে অন্তত এক রাত্রি বাস না করলে নিকাহ্ অসিদ্ধ হয়ে যায়, গুণাহ্ হয়। আগা এলে গ্রামের যুবতী মেয়েরা এবং তাদের বাবা মায়েরা খুবই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং আগার কাছে তাদের মুতার জন্য পেশ করে। আগাও মেয়েদের বয়স সৌন্দর্য বিচার করে কাউকে এক রাত্রি, কাউকে দু রাত্রি মুতার জন্য নির্দিষ্ট করে। অনেক স্বামীও পুণ্যের আশায় নতুন বিয়ে করা বৌকে তালাক দিয়ে মুতার জন্য আগার হাতে তুলে দেয়। আগা তার মুতা সমাপ্ত করে ফিরে গেলে, সেই তালাক দেওয়া স্বামী তার প্রাক্তন স্ত্রীকে আবার নিকাহ্ করে।

এই অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা এতই নগণ্য যে নেই বললেই হয়। সামান্য কিছু সরকারি কর্মচারী আর কার্গিল অঞ্চলের কিছু ব্যবসায়ী, ব্যাস, হিন্দু বলতে এই কজনই। এখানে বহু হিন্দু প্রলোভনে পড়েও মুসলমান হয়ে যায়। লাদাখ অঞ্চলে তো বৌদ্ধ মেয়েদের মুসলমানেরা বেশ ভালো সংখ্যায় বিয়ে করে নিচ্ছে। বৌদ্ধরা মুসলমানের উচ্ছিষ্ট খায়, কিন্তু মুসলমানেরা বৌদ্ধদের ছোঁয়া জলও গ্রহণ করে না। বৌদ্ধরা যে কোনো কারণেই হোক, নিজেদের মুসলমানদের চেয়ে হীন ভাবে এবং সেজন্যই তাদের ঘরের মেয়েদের মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দিতে কোনো দ্বিধা দেখা যায় না।

কার্গিল—সিম্‌সখৰ্‌বু থেকে পনেরো মাইল এগিয়ে, শ্রীনগর থেকে একশো তেইশ মাইল দূরে সমুদ্রতট থেকে পাঁচ হাজার সাতশো নব্বই ফুট উচ্চতায় কার্গিলের অবস্থান। কার্গিল তহসিলের সদরও এই কার্গিল শহরে। এখানে তহসিলদারের অফিস ছাড়া, একটি হাসপাতাল, ডাক ও তার ঘর এবং একটি প্রাইমারি স্কুল আছে। বাজারে দোকানদারদের মধ্যে জনাকয়েক হিন্দু আছে। এখানকার ডাকবাংলো এবং ধর্মশালা, দুটোই বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবস্থাপনাও ভালো। কার্গিলের জলবায়ু শুকনো এবং শীত প্রধান। তাপমান গ্রীষ্মের দিনেও একশো ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি ওঠে না। কিন্তু শীতে তাপমান শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে (-৪২ডিগ্রি) নেমে যায়। বাইরে থেকে আগত যাত্রীদের এখানকার শুকনো আবহাওয়ার জন্য মুখ, হাত পা ফাটতে থাকে। গায়ের রঙও তামাটে কিংবা কালিবর্ণ হয়ে যায়। কিছুদিন আগে এক সাধু এসে এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। তিনি নিজের উদ্যোগে একটা শিব মন্দির গড়েছিলেন। পরে নানা কারণে হতাশ হয়ে এই জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কীর্তিটি এখনও পর্যন্ত অটুট আছে।

যুক্‌ থেকে লাদাখে আসতে হলে খল্‌চি হয়ে আসতে হয়। খল্‌চিতেও ডাকঘর এবং

ডাকবাংলো আছে। সেখানে এক ইংরেজ পাদরি দম্পতি এবং দু-তিনঘর খৃস্টান বাস করে। পাদরি দম্পতি একটি স্কুল চালায়। গ্রামে কয়েকঘর মুসলমান আছে এবং তারা মূলত বৌদ্ধ মেয়েদের বিয়ে করেই এই গ্রামে বাস করছে। মুসলমানরা এখানে দোকানদারি করে, কেউ কেউ চাষের কাজও করে। বাইরের মুসলমান এবং স্থানীয় বৌদ্ধ মেয়েদের সংযোগে ভূমিষ্ঠ সন্তানদের বলে 'অর্গেন।' এদের গায়ের রং ফর্সা এবং চেহারাও সুন্দর। ধর্মের বিষয়ে কিন্তু এরা কটুর মুসলমান।

**রিজোঙ**—খল্টি থেকে নুর্লা হয়ে আরও এগোলে সামনে একটা নালা পড়ে। সেখান থেকে মাইল কয়েক দূরে পাহাড়ের ওপরে রিজোঙ গুম্ফা। স্থানীয় ভাষায় 'রি' শব্দের অর্থ পাহাড় এবং জোঙ শব্দের অর্থ কেল্লা। প্রধান গুম্ফার আধমাইল নিচে চোমোদের থাকার আবাস। এটা হলুদটুপি সম্প্রদায়ের গুম্ফা। প্রাচীন কালে যখন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে ঢোকে তখন তা শুদ্ধরূপেই এসেছিল। তখন তিব্বতীদের নিজস্ব ধর্ম ছিল বোনজ। কালক্রমে বৌদ্ধ লামাদের মধ্যেও ওই বোনজ ধর্মের কিছু কিছু প্রভাব পড়তে থাকে। এরপর ভারতবর্ষ থেকে মহাপণ্ডিত এবং ধর্মসংস্কারক, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যাকে তিব্বতীরা অতিশা বলে, ১০৪২ খৃস্টাব্দে তিব্বতে আসেন। তিব্বতেই লাসার কাছে ১০৫৪ খৃস্টাব্দে দীপঙ্করের মহাপ্রয়াণ ঘটে। এই মহাপুরুষ তাঁর স্বল্প সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কার করেন। রিজোঙ গুম্ফার ভিক্ষুণীদের সংখ্যা কুড়ি। এদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানে তারা লামাদের মতোই পোশাক পরে। চোমোরা লামাদের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমী এবং তারা প্রচুর কাজ করে। নালার দুপাশের বিস্তীর্ণ খেতে গম, যব, গ্রিম, শালগম ইত্যাদি চাষ করা হয়েছে যার বেশিরভাগ শ্রমটাই এসেছে চোমোদের কাছ থেকে। তারাই আবার মাইলের পর মাইল ধরে সফেদা, বিরি আর খোবানির গাছ পুতেছে।

গুম্ফাটির চারদিকেই পাহাড়। এই পাহাড়ের প্রাকৃতিক প্রাচীরের মাঝখানে ছোট একটি রাস্তা আছে যেটা দিয়ে হেঁটে গুম্ফায় পৌঁছানো যায়। বস্তুত গুম্ফাটি একটি পাহাড়ি কেল্লা। গুম্ফার নিচে খানিক দূরে একটি দোকান আছে। মদ, মাংস বহন করে নিয়ে আসার এইটাই শেষ সীমা। এর পরে আর ওই সব বস্তুকে নিয়ে যাওয়া যায় না। মঠে তামাক বিড়ি সিগারেট খাওয়াও কাঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এখানে প্রায় তিরিশ জনের মতো লামা আছে। এরা তিব্বতী ভাষায় নিজেদের গ্রন্থ পাঠ করে। এদের কুশোক (প্রধান মোহান্ত) কিছু সংস্কৃত জানে। আজকাল সে খর্দলুঙার ওপারে নুবরাতে বাস করছে। তার বিয়ে হয়েছে। চার-পাঁচ বছর আগে এখানে একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে। মন্দিরের ভেতরের চিত্রকারিতা সত্যিই খুব সুন্দর। শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ এবং ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়র দুটো বড় বড় মূর্তি রয়েছে। এখানে মন্দিরের মধ্যে জুতো পরে যাওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা আছে তবে তা পালনের জন্য কাউকে তংপর দেখলাম না। আসলে গুম্ফার তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েই দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে। সেটাকে অবশ্য পালনীয় করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। বোধ হয় বিদেশি পর্যটকদের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ রেখে এই নির্দেশ পালনের শিথিলতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন মন্দিরটিতে একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে। মন্দিরের এক কোণে একটি ভৈরবের মূর্তিও আছে যেটি অত্যন্ত অশ্লীল। এই সব অঞ্চলে বৌদ্ধদের সংখ্যা দিন দিন কমছে, কিন্তু সে বিষয়ে এদের কোনো দ্রুক্ষেপ



নেই। কিছু বললে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে। অন্য জায়গার তুলনায় রিজোঙের লামাদের শিক্ষাদীক্ষার মান কিছুটা উন্নত এবং আচার বিচারও ভালো।

সম্পোলা গ্রামের আগেই ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়র তিনটি বিশাল মূর্তি আছে। মূর্তিগুলোর উচ্চতা বারো হাতেরও বেশি হবে। কোনো এক সময়ে এরকম ধরনের বড় বড় মূর্তি ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মাক্রান্ত সে সবের কোনো চিহ্ন রাখেনি। ‘লা’ শব্দ যেমন পাস বা গিরিপথ, গিরিসংকটকে বলে তেমনই দেবতাকেও বলে। এদের মতে প্রতিটি গিরিপথেই দেবতার অধিষ্ঠান আছে তাই তার নাম লা। এরকম বিশ্বাস মুসলমানদের মধ্যে আছে তবে তারা এগুলোকে কোনো দেবতার নামে না বলে তাদের কোনো পীরের নামে বলে থাকে। সম্পোলা থেকে তিন মাইল আগে সম্পোলা গিরিপথ। গিরিপথের সামনে খানিকটা সমতল ভূমি আছে, যার এক পাশে নালার ধারে বজ্জোগো গ্রাম। বহুকাল আগে, প্রাচীন লাদাখের রাজধানী এখানে ছিল। লেহুতে রাজধানী পরবর্তী কালে হয়েছে। এখানে এখনও নগর প্রাকারের চিহ্নসহ অনেক ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। বসতি কমতে কমতে এখন সামান্যতে এসে ঠেকেছে। মুসলমানেরা এখানেও রয়েছে এবং সংখ্যাও তারা বাড়ছে। চারপাশে প্রচুর প্রাচীন স্তূপ এবং মানি রয়েছে। বজ্জোগোর আগেই একটি ময়দান আছে কিন্তু সেচের অভাবের জন্য সেখানে কোনো চাষবাস হয় না। দশ-বারো মাইল দূরে সিক্কুনদ, সেখান থেকে নালা কেটে আনা যেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় লোকজনের মধ্যে কোনো উৎসাহই নেই। এক নৈরাশ্যের অন্ধকারে ছেয়ে আছে তাদের ভবিষ্যৎ। লাদাখের ভবিষ্যৎ দুঃসময়ের কথা ভেবে এরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কোনোমতে জীবনযাপন করছে। আমরা ফসল শূন্য এই বালিমাটির ময়দানের মধ্যে স্থাপিত অনেক স্তূপ আর মানি পার হয়ে নিম্ন পৌছলাম। প্রথমেই দেখলাম সুন্দর একটি সফেদার বাগান। এখানকার লোক খাল কেটে জল এনে বিশাল পতিত জমিকে আবাদযোগ্য করে তুলেছে। গম, যব, গ্রিমের খেত চারদিককে যেন প্রাচুর্যে ভরিয়ে রেখেছে। আগস্টের শেষ দিকে খেতের ফসল কাটা হবে। নিম্ন থেকেই সিক্কু আমাদের সঙ্গে ছাড়া হয়ে গেলো। একটা ছোট গিরিপথ পার হয়ে আমরা আবার একটা বড় সমতল ভূমিতে এসে পড়লাম। সেখান থেকে চারদিকের হিমাচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গগুলিকে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

পয়াঙ— আরও দশ মাইল এগিয়ে রাস্তা থেকে দু-মাইল উঠুতে পয়াঙ গুম্ফা। পয়াঙ গুম্ফাটি খুব সুন্দর। লামার সংখ্যা খুব বেশি নয়, মাত্র দশ-বারো জন। এখানকার কুশোক একজন অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির সজ্জন মানুষ। এটা যেহেতু লালটুপি সম্প্রদায়ের গুম্ফা, অতএব এখানে বামাচারি দর্শন, মদ্যপান ইত্যাদির আধিক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এখানেও একটা নতুন মঠ স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ‘দোমছোগ’-এর একটি আলাদা মন্দির আছে। ওই মন্দিরের কাছে যেতেই তীব্র মদের গন্ধ নাকে এল। ছাদ থেকে জংলি জানোয়ারের মত শরীর, শিং বুলছে, মনুষ্যকরোটির পেয়ালা রাখা আছে দেবতার সামনে। মূর্তি এবং চিত্রকলা যতদূর অশ্লীল এবং নোংরা হতে হয়। বেচারী কুশোক সাধু প্রকৃতির হলেও কি করবে? এখানে এটাই নিয়ম। পয়াঙে কয়েকঘর মুসলমান বাস করে। এখানে পাহাড়ের নিচে খাত অঞ্চলে স্তোকের রাজা তার মুসলমান অপরাধী প্রজাদের নির্বাসিত করত। এখন ওখানকার জমি সেই নির্বাসিত অপরাধীদের বংশধরেরা ভোগ করছে।

পিতোক— পয়াঙ থেকে চার-পাঁচ মাইল এগোবার পর সিন্ধু নদের তীরবর্তী পর্বতশ্রেণী থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া একটা টিলার ওপরে পিতোক গুম্ফা। পিতোক খুবই সাধারণ গুম্ফা কিন্তু এর কুশোক বাকুলার বিদ্যাপ্রেম এবং মধুর স্বভাবের কথা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বর্তমান কুশোক এক সাত-আট বছরের বালক।

পিতোক থেকে চার মাইল এগিয়ে সমতল ভূমির ওপরে পাহাড়ের ধারে লেহ নগরী। এইটুকু পথে চড়াই খুব সামান্য। স্থানীয় ভাষায় ‘লেহ’ শব্দের অর্থ বর্নাবহুল জায়গা। তিব্বত, কুলু, পাঞ্জাব, ইয়ারকন্দ (চিনা তুর্কিস্তান) খোতন (আফগানিস্তান) প্রভৃতি জায়গার সওদাগরদের এই পথ ধরেই যাতায়াত করতে হয়। পাহাড়ের নিম্নভূমিতে লেহর অবস্থান। এর দৈর্ঘ্য আট মাইল এবং প্রস্থ তিন-চার মাইল। সিন্ধু নদ এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। লাদাখ ও তিব্বতের হিন্দুস্তানী ব্যবসায়ীদের লেহতে দোকান ও মালগুদাম আছে। গ্রীষ্মের সময় লাদাখের উজীর এখানে বাস করে। এখানে রাজ্যের তরফ থেকে একটি মিডল ইংলিশ স্কুল আছে। এছাড়া পশ্চটিকিংসালয়, হাসপাতাল আছে। আবার বৃটিশ সরকারও তাদের লোকজনের জন্য আলাদা একটি হাসপাতাল খুলেছে। ওই হাসপাতালের সমস্ত পরিচালনা ভার মোরাভিয়ান মিশনারিদের হাতে। এই মিশনারিদের প্রধান কাজ হল বৌদ্ধদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা আর এই কাজে তারা হাসপাতালটিকেও ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে হাসপাতালের ভার মিশনারিদের হাতে ছাড়ার কোনো অর্থ হয় না। রাজ্যের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে মিশনারিদের থাকার দরকারই বা কী? গরমের দিনে ছমাস বৃটিশ জয়েন্ট কমিশনার এখানে এসে বাস করেন। যেহেতু লাদাখের সীমানা তিব্বত এবং চিনা তুর্কিস্তানের সঙ্গে লাগোয়া, সেজন্য ভারত সরকার তার রাজনৈতিক বিভাগের এক কর্মচারীকে এখানে রেখেছে।

লাদাখ তহশিলে শ্রেফ আটজন পুলিশের সিপাহি আছে, এবং বস্তুতপক্ষে তাদেরও কোনো কাজ নেই। ফৌজদারি মামলা এখানে বড় একটা হয় না। গ্রামেও চৌকিদারের কোনো প্রয়োজন নেই। অনেকগুলো গ্রাম ধরে একজন নম্বরদার এবং অনেক নম্বরদার ধরে একজন জেলদার, যাদের কাজ হল সময় মতো হাকিমদের কাজে সহযোগিতা করা। নম্বরদার তার এলাকার খেত থেকে ফসলের পাঁচ শতাংশ পায়। জেলদারের আমদানি বছরে সত্তর থেকে একশো টাকা। এখানকার লোক অধিকাংশই অত্যন্ত সরল এবং একটু ভিত্তি প্রকৃতির। একজন মামুলি সরকারি চাপরাশি তাদের ওপরে যে ধরনের দাপট দেখায়, তা আমাদের দেশের একজন পুলিশের সাব ইনসপেকটরও দেখাতে সাহস করে না। এ ধরনের অবস্থার সবচেয়ে খারাপ দিক হলো এখানকার নাগরিক এবং গ্রামীণ অধিকাংশই বৌদ্ধ। তারা সোজা, সরল এবং কিছুটা ভীক প্রকৃতির, অন্য দিকে, চাপরাশি, নম্বরদার, জেলদার ইত্যাদিরা অধিকাংশই মুসলমান। এরা কথায় কথায় ওই সোজা সরল লোকগুলোর ওপরে জোর জুলুম চালায়। বৌদ্ধদের ঘরের মেয়ে ভাগিয়ে নেওয়ার পিছনে অধিকাংশ সময় এদের হাত থাকতে দেখা গেছে। হাকিম ও যাত্রীদের জন্য গ্রামের একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে নিয়মিত সংখ্যায় ঘোড়া এবং অন্যান্য জিনিসপত্র, লোকজন রাখার নিয়ম আছে। এখানে যারা মালপত্র বহন করে, তাদের মজুরি অত্যন্ত কম। অধিকাংশ যাত্রী দিনে দশ-বারো মাইল পথ চলে। ওই পথ চলার মাইলের হিসাবে ভারবাহকদের মজুরি নির্দিষ্ট আছে। লোকে ওই

স্বল্প মজুরিতে অনেক কষ্টে দিন গুজরান করে। কারণ এছাড়া অন্য কোনো উপার্জনের পথ তাদের কাছে খোলা নেই।

কার্গিল এবং স্কর্দু এই দুই তহসিলের মুসলমানদের মধ্যে প্রায় সকলেই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। যে কঘর বৌদ্ধ আছে তারা প্রধানত গখুন এলাকার কয়েকটি গ্রামে বাস করে। বাইরে থেকে আগত বৌদ্ধরা বেশিরভাগ থাকে মুল্বে ও জাংস্কর গ্রামে। এদের মোট সংখ্যা তিন হাজার। কার্গিল থেকে লাদাখ যাবার পথের ধারে পড়ে মুল্বে গ্রাম। এখানকার বৌদ্ধদের বর্তমান অবস্থা কিরকম? সেটা একটা উদাহরণ দিয়েই বোঝানো যাবে। বোধ-ঘুবুর (সিম্সা-খুর্ব থেকে আলাদা জায়গা) দিকে বাস করে, আঠারো-উনিশ বছর হবে এমন একটি যুবককে কার্গিলে পেলাম। যুবকের মা মুসলমান, কিন্তু তার বাবা, তিনভাই ও দুই বোন বৌদ্ধ। তাহলে তুমি কেন মুসলমান? এই প্রশ্নর উত্তরে সে বলল— আমার মা যে মুসলমান। বাবা মুসলমান হলে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই মুসলমান হবে কিন্তু মা মুসলমান হলে এক ছেলেকে অবশ্যই মায়ের ধর্মের হতে হবে যাতে মায়ের শেষ যাত্রায় সে ফাতিহা পড়তে পারে। মা মুসলমান শুনে একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে সাধারণ ঘরের মুসলমানেরা, মুসলমান খানদান না পেয়ে বাধ্য হয়ে অমুসলমানের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এরাও বৌদ্ধ পিতা মাতারই সন্তান, যাদের কেউ কেউ প্রলোভনে পড়ে ইসলামের দলে নাম লিখিয়েছে।

এই শিয়া মুসলমানেরা কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পর্যন্ত কাফের বলে ঘৃণা করে এবং তাদের ছোঁয়া জলও খায় না। মুল্বে এবং জাংস্করের মতো জায়গাতে বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম স্বীকার না করে বেশি দিন নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। প্রথম দিকে হয়তো একঘর মুসলমান কোনো বৌদ্ধপ্রধান গ্রামে এসে বসবাস শুরু করল। প্রথমেই সে নিজের ও নিজের সমধর্মী আত্মীয় বন্ধুদের জন্য কয়েকটি বৌদ্ধ মেয়েকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে পরিবারের বাইরে বার করে এনে তাদের সমাজভুক্ত করে নেবে, যদিও মুসলমানেরা বৌদ্ধদের ছোঁয়া জল পর্যন্ত পান করে না। অথচ উন্টোদিকে বৌদ্ধরা এমনকী তাদের বড় বড় লামারও মুসলমানদের উচ্চিষ্ট খেতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না। এই সব কারণে মানসিকভাবে বৌদ্ধরা নিজেদের হীন ভাবে এবং মুসলমানদের তাদের চেয়ে উঁচু মনে করে। অতএব সেই উঁচু মুসলমানেরা বৌদ্ধ মেয়েকে বিয়ে করলে তারা বরং খুশি হয়। বালতিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। স্থানীয় এক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলছিলেন—গ্রামের জনসংখ্যার সত্তর-আশি ভাগই পুরুষ। আমি নিজেও দেখেছি যে পুরুষের সংখ্যা সন্দেহাতীতভাবেই বেশি। সাম্প্রতিক কালে আদমশুমারির রিপোর্টেও বালতিস্তানের জনসংখ্যার হঠাৎ এরকম বিষম হারে বৃদ্ধির কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই বর্ধিত জনসংখ্যা আশপাশের অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করবে এটা তো স্বাভাবিক। এইভাবে বর্ধিত সংখ্যার মুসলমানেরা একজন-দুজন করে বৌদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছে। বৌদ্ধরাও খুশি মনেই তাদের নিজেদের গ্রামে ঠাই দিয়েছে। কারণ তাদেরও ছাগল মেষ জবাই করার জন্য অন্য ধর্মের লোক প্রয়োজন হয়। দেখতে দেখতে এক ঘর, চার ঘরে পরিণত হয়। একদিন ঠাঁটবাটের সঙ্গে তাদের আগাকে (গুরু) গ্রাম সফর করায়। তাদের দেখাদেখি বৌদ্ধরাও কিছু না বুঝে শুনে আগার খিদমত খাটতে থাকে। আগা তাদের ইসলামি জীবনযাত্রা, চাল চলন সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেয়।

এখানকার গ্রাম, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসা নদী বা নালার কিনারায় অবস্থিত। আগার সওয়ারি নদীতীরের প্রতিটি গ্রামেই সফর করে। এভাবে কয়েক বছর সফর চলার পর সম্পূর্ণ গ্রামটি মুসলমান হয়ে যায়। এইসব আগার দল অত্যন্ত ধূর্ত। যখন দেখে মুসলমানের সংখ্যা কম, তখন শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা শিকেয় তুলে রাখে, কোরাণ হাদীসের নিয়ম পালনের জন্য কেনো জোরাজুরি করে না। নিজের অনুগামীদের বৌদ্ধদের সঙ্গে নাচ গান করতেও অনুমতি দেয়। কিন্তু যেই সমস্ত গ্রাম ধর্মান্তরিত হয়ে গেলো, তক্ষুনি ফতোয়া জারি হয় বন্ধ করো সমস্ত কাফিরানা হরকত। আর তখন নব দীক্ষিত মুসলমানরাও তাদের এতদিনকার কৃষ্টি সংস্কৃতি ভুলে কট্টর মুসলমান হয়ে ওঠে। এই সমস্ত ভণ্ডামি বৌদ্ধরা কখনওই বরদাস্ত করতে পারে না, কিন্তু হিন্দুদের মতো তাদেরও অনেক দুর্বলতা আছে। তারা নিজেদের গুম্ফায় পূজা দেয় আবার মুসলমানের পীরের দরগাতেও মানত করে। আসলে তারা তাদের গৌরবময় ধর্মের কিছুই প্রায় জানে না। এখন শুধু ভূত প্রেতই ধর্মের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে আছে। আর জানবেই বা কি করে? যারা জানাতে পারে সেই লামারাই এখন চব্বিশ ঘণ্টা ছুঁ পান করে মত্ত হয়ে থাকে। কামবাসনা তৃপ্তির জন্য তারা এখন ধর্মানুসারেই স্ত্রী ভোগ করে এবং গৃহস্থের পরিশ্রমের ফসলে ভাগ বসায়। এইসব নিয়ে তারা এত মৌজে আছে যে আপন কর্তব্য কর্ম পালনের কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। নাহলে বৌদ্ধদের আজ তাদের ভূমিতেই এরকম হতদুর্দশায় পড়তে হতো না। মূলবের গুম্ফাটি ভেঙে পড়ছে, কারণ তাদের অনুগামীর সংখ্যা দিনের পর দিন কমছে। সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন মূলবে ও জাংস্কর অঞ্চলে একটিও বৌদ্ধ গুম্ফা এবং একজন বৌদ্ধও থাকবে না।

এদিকে চল্লিশ বর্গমাইল এলাকায় একজন পাটোয়ারি থাকে। যদি পাটোয়ারি মুসলমান হয় তাহলে তো কথাই নেই। হয়তো তার চাপরাশি এবং পেয়াদাও মুসলমান। পেশকার, সেরেস্তাদারদের অধিকাংশই মুসলমান। তহসিলদার (যার ওপরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বভার থাকে) সেও যদি মুসলমান হয়, তাহলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হিন্দু হলেও কিছু করতে পারে না। নিম্নপদস্থ সহকর্মীদের ভয়েই তটস্থ থাকে, এ অবস্থায় এই সোজা সরল বৌদ্ধদের জীবনে আর কিই-বা হতে পারে। হিন্দু রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা আইনি, বেআইনি সমস্ত পথেই তাদের সহজ সরল প্রতিবেশীদের দমিয়ে রাখে। বৌদ্ধদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীনগরের কথাই ধরা যাক। সেখানে লাদাখ, ইয়ারকন্দ অঞ্চলে যাতায়াতকারি বণিকদের জন্য সুন্দর পাকা দোতলা একটি সরাই আছে কিন্তু সেই সরাইতে বৌদ্ধ বণিকদের বাস করার অনুমতি নেই। তারা ইদগা ময়দানে তাদের ছোলদারি (ছোট তাঁবু) টাঙিয়ে রাত্রিবাস করে। সেদিন আমাকে সিঙ্কু তটবর্তী গর্খুন গ্রামের লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল — আমাদের মহারাজ কি ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হয়েছেন? তাহলে তাঁর মুসলমানি নাম কি হয়েছে? হিন্দু নাম তো হরিসিংহ ছিল। অনেক বলাতেও তার সন্দেহ ঘুঁচল না। কারণ কথাটা, কোনো মুসলমানের মুখ থেকে শুনেছে, সে আরও খেদ প্রকাশ করে বলল— যখন আমাদের রাজাই মুসলমান হয়ে গিয়েছেন তখন কে আর আমাদের দেখবে? আমাদের তো এখন মুসলমানদের করুণার ওপরে নির্ভর করে থাকা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আর না হলে সকলকেই মুসলমান হয়ে যেতে হবে।

লাহুল—

ফোলংডুন্ডা—১৫০০০ ফিট

বড়লাচার কাছে— উত্তরে

সোমবার ২৫.৩.৩৩.

প্রিয় আনন্দজি

তেরোই ডিসেম্বর লেহ্ থেকে রওনা হই। পঞ্চাশ ঘাটটি ঘোড়া আর খচ্চরের বেশ বড়সড় একটা কাফিলা। কুলু পর্যন্ত পৌঁছাতে চারটি গিরিসংকট পার হতে হবে। প্রথম দুটিকে পার করে তৃতীয়টিকেও আজই পার করব এমন ভাবনা ছিল, কিন্তু কাল সন্ধ্যা থেকে এখানে বর্ষা নেমেছে আর সেই সঙ্গে চলছে তুষারপাত। মধ্যরাত্রির পর থেকে নিম্ন এলাকাতেও বরফ পড়া আরম্ভ হয়েছে। দিনের বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ যখন চিঠি লিখছি, তখন আশপাশে চারদিকে তাকিয়ে দেখছি সমস্ত পর্বতমালা, অরণ্য মাঠঘাট বরফে সাদা হয়ে আছে। বৃষ্টি একেবারে ধরেনি। অল্পবিস্তর ঝরছেই। সকলেই আশা করছে যে আগামী কাল অন্তত রওনা হতে পারবে। তবে সবই নির্ভর করছে আবহাওয়ার মর্জি মেজাজের ওপরে। এখন দেখি কতদিন আবার এখানে আটকে থাকতে হয়। যাইহোক, লেহ্ থেকে আবার আমার ভ্রমণের দিনলিপি শুরু করছি।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল ২০ সেপ্টেম্বর রওনা হব। পরে খচ্চরওলারা তাগাদা দিতে লাগল তাড়াতাড়ি করার। আমার মাত্র দুটো কাজ বাকি থেকে গিয়েছিল— এক তিব্বতী ভাষায় চারটি বইয়ের অন্তিম সংশোধন, আর দ্বিতীয় ‘মল্লিমিনিকায়’ গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ। তিব্বতী বইগুলোর কাজ শেষ করে ফেলেছিলাম। আর ১৪ সেপ্টেম্বরের রাত্রিতে ‘মল্লিমিনিকায়’ এর কাজও শেষ হয়ে গেলো। বন্ধু বান্ধবের দেখা করার পালাও এক সময় শেষ হলো। খচ্চরওলাদের বললাম যে আমি ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার সিন্ধুতটের দক্ষিণে অবস্থিত কিছু মঠ দেখব। আর সোমবার সিন্ধুর বাঁ-দিকের তটে মর-চি-লঙ এ তাদের সঙ্গে মিলিত হব। রবিবার জন্মুর এক ব্রাহ্মণ সজ্জনের বাড়িতে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ ছিল। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার তাগিদে লেহ্ থেকে রওনা হলাম। আট-দশজন বন্ধু বিদায় জানাতে এসেছিল। প্রায় পৌনে তিনমাস থাকার ফলে আবাহন হীন লেহ্‌তে বিদায় বেলায় মমতার সন্ধান পেলাম। লেহ্ যতই লোকজনকে আহান না করুক এখানকার দু-চারজন বৌদ্ধ ও বসবাসকারি ভারতীয়দের মধ্যে এখনও ভদ্রতা ও মমত্ব বোধ আছে। বিরি বা সফেদার ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দাও। মাটিতে সামান্য আর্দ্রতা থাকলেই সেখানেই সে শিকড় প্রসারিত করে গাছ হয়ে উঠবে। হয়তো বিরির মতো নয়। তবুও পৌনে তিন মাসে আমার হৃদয়েও অস্থায়ী রূপে কিছু কিছু শিকড় প্রসারিত হয়েছে। লেহ্ থেকে বাইরে বেরিয়ে একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকালাম আর মনে মনে বললাম, এরপর আমাদের দেখা হতেও পারে, নাও পারে, নিশ্চিত কিছু নেই। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। শ্রীজোজক গোর্গেনের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে সতি খুব কষ্ট হচ্ছিল। লাদাখে ইনিই ছিলেন একমাত্র সজ্জন, যিনি নির্ভুল ও পরিষ্কারভাবে ভোট (তিব্বতী) ভাষা লিখতে পারেন। তাঁর বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। ভোট সাহিত্য অধ্যয়নেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো ব্যয় করেছেন। তরুণ বয়সে ইনি খৃষ্ট ধর্ম আশ্রয় করেছিলেন সেজন্য তখন তিনি বৌদ্ধ দর্শনের দিকে সম্যক দৃষ্টি দেননি। বিশুদ্ধ সাহিত্যেও তাঁর ভালো পাণ্ডিত্য আছে। আমিও বলছিলাম, উনিও আফশোষ করছিলেন যে সতিই ওঁর পরে লাদাখে ওঁর মতো

বিদ্বজ্জন আর কেউ থাকবে না। গোর্গন মহাশয় বয়সে প্রবীণ হলেও এখনও স্বচক্ষে রেলগাড়ি দেখেননি। বলেন—‘ছবিতে দেখেছি।’ শ্রীনগরের নিচেই কোনো দিন যাননি। এরকম একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনও দেখা হবে কিনা সে কথা ভেবে মন অবসাদগ্রস্ত হচ্ছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, কারণ আমাদের উভয়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত এক।

লাদাখের বৌদ্ধরা এখন যার ওপরে তাদের আশা ভরসা সমর্পণ করে রয়েছে সে হলো তরুণ নোনো ছে-র্তন-ফুন-ছোগ্। ভোট ভাষায় তার জ্ঞান যথেষ্ট এবং লেখাতেও সাবলীল। নোনো আমার সঙ্গেই মর-চি-লঙ পর্যন্ত যাচ্ছে। বেলা একটা নাগাদ আমরা দুজনে দুটোঘোড়ায় চড়ে বের হলাম। প্রাচীন রাজধানী শোহ্, লেহ্ থেকে ছ-মাইল। সেখানে এখনও রাজপ্রাসাদ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানীকে সিন্ধুতট থেকে সরিয়ে লেহ্‌তে নিয়ে আসা হয় তখনও শোহ্‌র গরিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। লাদাখের রাজপরিবারে রাজকুমারদের জন্মের সময়, গর্ভাবস্থার অন্তিম মাসে শোহ্‌র রাজপ্রাসাদে রানিরা এসে বাস করত। প্রাসাদের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু তার দেয়ালগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। রাজমহল সংলগ্ন দেবালয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় কুড়ি-পঁচিশ হাত উঁচু বুদ্ধের একটি বিশাল মূর্তি আজও বর্তমান। মূর্তির মাথার দিক দেখতে হলে মন্দিরের ওপরের তলায় উঠতে হয়। মন্দিরের দেয়ালে এক সময় অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্রপট ছিল। চিত্রপট অবশ্য এখনও আছে কিন্তু তা আর সুন্দর নেই, ধোঁয়ায় কালো হয়ে সেগুলো তার সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। এখন বহু কষ্ট করে দেখতে হয়। এছাড়া সেখানে কিছু মাটি ও পিতলের মূর্তি রয়েছে। নিচের তলায় সামনের দিকে একটা বেশ বড় ঘর আছে যেখানে সকল-গুর-এর অনেক গ্রন্থ রক্ষিত আছে। দু-বছর আগে আমি যখন এখানে আরেক বার এসেছিলাম, তখন ঘরের মেঝে ও অন্যান্য বইয়ের (তজ্জুর ও কজ্জুর) খোলা পৃষ্ঠা, যার পরিমাণ প্রায় দু-তিন মণ হবে, পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। এবার দেখি সেই পড়ে থাকা পৃষ্ঠার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বোঝা গেলো, যারাই এই দেবালয় দর্শনে এসেছে, ফিরে যাবার সময় দু-তিনখানা পৃষ্ঠা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্য নিয়ে গেছে। তবে সেটা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে নয় পুণ্যার্জনের আশায়। অবশ্য কাশ্মীরের গিলগিট অঞ্চলে যেখানে তেরোশো বছরের প্রাচীন গ্রন্থের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্তদের মধ্যে বিলি করা হয়, সেখানে এ আর বড় কথা কী? এখানে তো পৃষ্ঠা ছেঁড়া অবস্থাতেই পড়েছিল।

গ্রামের মধ্যে আরেকটি লহ-খঙ (দেবালয়) আছে। শুনলাম সেখানে অরমার প্রাচীন মঠের মূর্তি আছে। দেবালয়ের পূজারি একজন লহ-পা। লহ-পা তাদেরই বলা হয় যাদের ওপরে দেবতা ভর করে। বর্তমানে লহ-পা একজন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। মন্দিরটি ছোট, কিছু মূর্তিও রয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই কেমন যেন শ্রীহীন ভাব। গ্রামটিও যেন উজাড় হওয়ার পথে। লোকে বলল, যখন লাদাখ স্বাধীন ছিল, তখন ওই রাজপ্রাসাদ ঘিরেই মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল।

এখান থেকে শো-লোন-পো-এর বাড়ি গেলাম। উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিদের লোন-পো বলে। অনেক আগে এই বংশ লোন-পো পদে অধিষ্ঠিত ছিল। এখন সেই পদ তাদের না থাকলেও নামের সঙ্গে ওই পদের গরিমা যুক্ত হয়ে গেছে। বর্তমান লোন-পো, তেমন কিছু উঁচু পদের রাজকর্মচারি নন, সামান্য নম্বরদার মাত্র। লোন-পো-র একটিই ছেলে, সে স্থানীয় মিডল ইংলিশ

স্কুল পাশ করে ট্রেনিং নিচ্ছে। লোন-পো-র বাড়িতে চা পান পর্ব সেরে টিক্সের উদ্দেশে রওনা হলাম। পথের দু-ধারে বেশিরভাগ খেতের ফসলই কাটা হয়ে গেছে। ফসল কাটার পরিশ্রমকে খানিকটা আনন্দদায়ক করার জন্য কর্মরত স্ত্রী-পুরুষেরা সমস্বরে গান গাইছিল। এদের সুরেলা গলা মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে কিংবদন্তির কিম্বদন্তি দেশ এখানে কিংবা এর কাছাকাছি কোথাও ছিল। লাদাখ অঞ্চলের অধিকাংশ পাহাড়ের মতো এদিককার পাহাড়গুলোও দেখলাম গাছপালা শূন্য। দু-একটা বিরি বা সফেদা গাছ প্রাণপণে এখানে কিছু সবুজের চিহ্ন ফোটারবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাদের নিজেদের অবস্থাই এত খারাপ যে তাদের দেখে কষ্ট হয়। পাতা সমস্ত হলদে, ঝরে পড়ার আগের মুহূর্ত বলা যায়। আর কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যেই এই গাছগুলো শুকনো কাণ্ড-সর্বস্ব আধমরা গাছে পরিণত হবে। তখন আকুল হয়ে খুঁজলেও কোথাও এক কণা সবুজও দেখতে পাওয়া যাবে না।

টিক্সের জন্য আর মাত্র ছ-মাইল চলা বাকি। এদের ঘোড়াগুলোও যথেষ্ট টগবগে যার জন্য পৌঁছাতে দেরি হলো না। লাদাখে টিক্স-সে, পি-তোক, রিজোঙ আর লি-কির এই কটি গে-লুক-পা (হলুদ টুপিধারি) সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ। লি-কির মঠের নিজস্ব কোনো অবতারী লামা নেই। একাদশ শতাব্দীতে এই মঠ স্থাপিত হয়েছিল। বাকি তিনটি মঠেরই নিজস্ব অবতারী লামা আছে, লাদাখী ভাষায় যাদের বলে কুশোক। পি-তোকের কুশোক এখন পনেরো-ষোলো বছরের তরুণ, এখন লাসায় পড়াশোনা করছে। রিজোঙের কুশোকের বয়স এখন চার-পাঁচ বছর। একেবারেই শিশু বলা যায়। টিক্সের বর্তমান কুশোকের জীবন কাহিনিও নানা বৈচিত্র্যে ভরা। তাঁর বাবা লাসার একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি। একমাত্র পুত্র হওয়া সত্ত্বেও মঠের সম্পত্তির লোভেই হোক কিংবা অবতারবাদের মায়াজালে আবদ্ধ হয়েই হোক, বাবা ছেলেকে কুশোক হবার জন্য মঠে দিয়ে দেয়। ছেলেবেলাটা আর পাঁচটি ছেলের মতোই কিছু পড়াশোনা, আর কিছু খেলাধূলা করে কেটেছে কিন্তু যখন সে যুবা বয়সে পৌঁছল তখন সংযমের কঠিন অনুশাসনে আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারল না। প্রথমে লুকিয়ে মদ্যপান এবং নারী সংসর্গ চলত, পরে তা প্রকাশ্যেই হতো। তামাকের নেশা তিব্বতে লামাদের কাছে এক অমার্জনীয় অপরাধ কিন্তু এই কুশোকের সিগারেট না হলে চলতই না। যে লামারা নিজেরাই সারাদিন মদে ডুবে থাকে তারাই কুশোকের মদ্য ও তামাকাসক্তি নিয়ে কথা তুলতে লাগল। গৃহস্থ ভক্তরাও কুশোকের কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করে না, কারণ কুশোক তাদের কাছে একজন সিদ্ধ পুরুষ। তবে অনুযোগ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু পাথর যখন পাহাড় থেকে নিচে গড়ায়, তখন গড়াতেই থাকে। এই কুশোকও শেষে তার বিলাস ব্যসনের খরচ তোলার জন্য মঠের দুর্মূল্য জিনিসপত্র বিক্রি করতে আরম্ভ করল। এই নিয়ে মঠে মারামারি এমনকী এখানে যেটা খুব কমই হয়, সেই মামলা মকদ্দমা পর্যন্ত বিষয়টি গড়াল। শেষ পর্যন্ত কুশোককে লাদাখ ছেড়ে চলে-যেতে হলো। আমি যখন এর আগে লাসাতে ছিলাম তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে তখন আর টিক্সের কুশোক নয়, লাসার একজন পুলিশ অফিসার। কথাবার্তায় তাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলেই আমার মনে হয়েছিল। তবে আমি লাসা থেকে চলে আসার পর তার জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যেগুলো তাকে জীবনের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তার থানা ছিল লাসার কাছে, সে-রা মঠে যাবার রাস্তার ধারে। সে-রা মঠ তিব্বতের এক বিখ্যাত মঠ। তবে এর পাঁচ হাজার

ভিক্ষুদের মধ্যে অল্পই, সামান্য লিখতে পড়তে পারে। তিব্বতের অধিকাংশ মঠেরই এখন এই দশা। যাইহোক, এই লেখাপড়া না করা লামার দল সারাদিন খেয়ে বসে গড়িয়ে সময় কাটায় এবং যত রকম দুর্ভিক্ষ আছে তার সঙ্গে যুক্ত। বহুবার এমন হয়েছে যে সে-রা মঠের ঢাবারা (ভিক্ষু-লামা হবার আগের পর্যায়ের) আকণ্ঠ মদ গিলে রাস্তা দিয়ে ছল্লোড় করতে করতে যাতায়াত করছে। তাদের ভয়ে পথিকেরা সন্ত্রস্ত থাকত। আমি লাসায় থাকাকালীন একদিন আমাকে টিক্সের ওই প্রান্ত্রন কুশোক এবং তখনকার পুলিশ অফিসারটি আমায় বলেছিল যে—এই ঢাবাগুলো বড় বেশি উচ্ছৃংখল এবং হাস্যামা প্রবণ। এরা বুঝতে পারছে না যে একদিন এর পরিণাম কতদূর খারাপ হতে পারে। আমি চলে আসার তিন-চার বছর পরের ঘটনা, সে-রা মঠের ঢাবার দল বোধ হয় মদ খেয়ে তার থানার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বাড়াবাড়ি ধরনের হাস্যামা বাধিয়ে ছিল। ব্যাস, অফিসারের আদেশে থানার সিপাহিরা দিল গুলি চালিয়ে। গুলিতে বোধ হয় দুজন ঢাবার মৃত্যু হয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে এই ঘটনার কথা দাবানলের মতো চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেলো। সে-রাত্রে খবর পৌঁছানো মাত্র হাজার হাজার ঢাবা-ফৌজ রাস্তায় নেমে পড়ল। তারা ওই পুলিশ অফিসারের ওপরে প্রতিশোধ নেবে। ঘটনা ক্রমেই এত উদ্বেগজনক হয়ে উঠল যে, সে খবর দলাইলামার কানেও উঠল। দলাইলামার আদেশে ওই অফিসার সহ আরও কিছু সিপাহিকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বাগানে এনে (নোবু-লিঙ) রাখা হলো। সে-রা'র ঢাবাদের অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করা হলো। এদিকে ওই পুলিশদের জীবনে শুরু হলো নরক যন্ত্রণা। প্রতিদিন, মাসের পর মাস ধরে বেত্রদণ্ডের শাস্তি চলল। দু-বছর পর প্রতি নববর্ষের দিনে সেই অফিসারকে শেকলে বাঁধা অবস্থায় খাঁচায় ভরে শহরের রাজপথে ঘোরানো হতো। এখন সে-রা মঠেরই এক প্রভাবশালী ব্যক্তির জামিনে তাকে গলায় অপরাধী ছাপ মারা এক কাঠের তকমা লাগিয়ে ছাড়া হয়েছে।

টিক্সে মঠের হাতে প্রচুর জমি আছে। অনেকগুলো শাখা মঠও আছে। একশোর মতো ভিক্ষু বাস করে। মঠের অনেকগুলো দেবালয় ও দুটো বড় সংঘ সম্মেলনাগার আছে। প্রধান মন্দিরের মাঝখানে একটি স্তম্ভের ওপরে একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটির গড়ন এবং কারুকাজ দেখে মনে হয় এটি বেশ প্রাচীন এবং কোনো ভারতীয় কারিগরের হাতে তৈরি। মূর্তির পিছনে কাঠের বড় একটি চালা আছে। চালাটির সৌন্দর্য দেখে বিশেষ মোহিত হতে হয়। মূর্তিটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে প্রতিবেশী একটি পরিবার মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের ঘর থেকেই মূর্তিটিকে পাওয়া গিয়েছে। নিঃসন্দেহে ওই পরিবারটিকে অত্যন্ত ভালো বলতে হবে, নাহলে কাফেরদের চিহ্ন বলে ওই অমূল্য বস্তুটিকে নষ্ট করে ফেলবার অধিকার তাদের ছিল।

মঠ দেখে আমরা পাহাড় থেকে নামলাম এবং লারড বা অতিথিশালায় একখানা ভালো কুঠুরি নিয়ে জমিয়ে বসলাম। ওই সময় মঠের অধিকারীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি চলছিল। কুশোক কে হবে এই প্রশ্ন ওঠায় আমি বললাম— এবার ওইসব অবতারদের বিসর্জন দাও। পাঁচটি বুদ্ধিমান ছেলেকে বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে যাকে যোগ্যতম মনে হবে তাকেই কুশোকের আসনে বসিও। তারা সকলেই সম্মুখে আমার কথা সমর্থন করে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই যথার্থ হবে। তবে তারা আমার কথায় ‘হ্যাঁ’ বলল বটে কিন্তু এই হ্যাঁ কতদূর যে কার্যকর হবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিছানা বয়ে নেবার জন্য আমার একজন লোকের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়দিন লোকের



প্রতীক্ষা করতে করতে দশটা বেজে গেলো। অবশেষে লোক এলে বিছানাসহ জিনিসপত্র তাকে দিয়ে দেবার কথা বলে, আমরা দু-জনে অর-মার দিকে রওনা হলাম। এই জায়গাটা টিক-সে থেকে দু-মাইল দূরের এক পর্বতশৃঙ্খলার মধ্যে। কোনো এক সময়ে এখানে বিশাল মঠ ছিল, শতাব্দিক ভিক্ষু বাস করত। মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহান লো-চ-ব-রিন-ছেন ব্সঙ-পো (মৃত্যু ১০৫৫খৃঃ)। তিব্বতের প্রাচীন মঠগুলির মতো এই সংঘারামটিও পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত না হয়ে সমতলে অবস্থিত। এটি চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, যার কিছু কিছু অংশ এখনও প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। মাঝখানে ছিল অনেকগুলো দেবালয়, স্তূপ এবং ভিক্ষু আবাস। স্তূপগুলি আজও প্রায় সেভাবেই আছে যদিও তার গায়ে সময়ের স্পর্শ লেগেছে। দেবালয়ের কয়েকটি দেয়াল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্কর-দো (বালিস্তান) - এর আলি মীর লাদাখ আক্রমণ করে এবং এখানকার সমস্ত মঠ, মন্দির, পুস্তকাগার সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। মনে হয় সেই আক্রমণে সংঘারামটিও ধ্বংস হয়ে যায়। এখন ছোট করে নতুন একটি মন্দির তৈরি করা হয়েছে, যার পূজারি টিক-সে মঠেরই এক ভিক্ষু। আমাদের নিশ্চিত করে বলা হয়েছিল যে যখন আমরা এখানে আসব, পূজারিও তখন এখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। আড়াই ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে আমরা অর-মার যত ভব্য ধ্বংসাবশেষ ছিল, সব দেখলাম কিন্তু পূজারির পাতা নেই। আগেকার মঠগুলোর থেকে এদের ধরন-ধারণ কেমন যেন একটু অন্যরকমের। এই মৃত বিহার থেকেও ভারতীয় বিহারের গন্ধ আসছিল। গোগার্ন বললেন — শুনেছি যে অর-মার কিছু স্তূপের মধ্যে প্রাচীন চিত্রকলা রক্ষিত আছে। খুঁজতে খুঁজতে একটা স্তূপের একদিকে ছোট একটা দরজা দেখতে পেলাম, সেখান দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে স্তূপের ভেতরে ঢুকলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে সত্যি গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আটশো বছরের প্রাচীন এই চিত্রকলাকে শ্রেফ পাথর ঠুকে ঠুকে নষ্ট করা হয়েছে। শুনলাম আশপাশের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে গেছে, এটা তাদের কাজ। স্তূপের ওপরের গম্বুজটি ভাঙা। সেখান থেকে বৃষ্টির জল এবং তুষার ভেতরে ঢোকে। স্তূপের ভিতরে নিবিড় অন্ধকার। গম্বুজের ভাঙা অংশ আর ওই ছোট দরজা দিয়ে যেটুকু অনিচ্ছুক আলো আসে তারই সহায়তায় চিত্রপটগুলির ছবি নিলাম। উঠবে কিনা তা তো ফিল্ম ওয়াশ করার আগে বলতে পারব না। ভালো করে অনেকক্ষণ দেখার পর একটা চিত্রপটের তলায় লেখা দেখলাম ‘মর-মে-মজদ-ল-ন-মো’ (দীপঙ্করায় নোম)। ওটি ছিল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ছবি। ছবিটির মাথা একেবারে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অন্য চিত্রগুলোর দশা দেখে বুঝলাম যে এই ছবিটির যে সামান্য অংশ এখনও ভালো আছে তাও আর থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। নোনো অনেক পরিশ্রম করে ছবিটিকে দেয়াল থেকে খসিয়ে আনল। ক্যামেরার বাস্কটিকে খালি করে তার মধ্যে পাতলা কাঠ আর উলের মোড়কে মুড়ে ছবিটাকে রাখল। সেখানেই সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটা মোহর (সীলমোহর) পেলাম যার মধ্যে বারো লাইন লেখা ছিল। আরও একটু খোঁজাখুঁজির পর শুধু এধরনের মোহর দিয়েই তৈরি একটি স্তূপের সন্ধান পেলাম। এই স্তূপটিও কালের নিয়মে এবং সংস্কারের অভাবে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই রক্তপথে বৃষ্টি ও তুষারগলা জল ঢুকে কাঁচা মাটির তৈরি মোহরের অধিকাংশকেই গলিয়ে ফেলেছিল। যাই হোক আমি ছ-খানি মোহর সংগ্রহ করলাম এবং সেগুলোকেও যত্ন করে উল দিয়ে মুড়ে রাখলাম। গতকাল অর্থাৎ উক্ত-ঘটনার সাতদিন পর উলের মোড়ক খুলে দেখি মোহরের অক্ষরগুলো ভেঙে মিলিয়ে

যাচ্ছে। সেজন্য দুটো মোহরকে আঙনে পুড়িয়ে পাকা করে নিয়েছি, আশা করছি এ দুটো মোহর বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে না। ছবিটাকে প্যাকিং খুলে দেখার সাহস হয়নি। একবারেই খুলব যাতে আনন্দ বা বিষাদ যা হবার একবারই হবে। অর-মাতে আরও কিছু কিছু প্রাচীন জিনিস পাওয়া যেতে পারে। কাশ্মীর রাজ্য এই অমূল্য সম্পদের অবহেলা করে ক্ষমাহীন অপরাধ করছে।

বেলা দুটো নাগাদ আমরা দুজনে আবার ঘোড়ায় উঠলাম। রণবীরপুরা যেতে অল্পক্ষণ সময় লাগল। বিগত ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে এখানকার সম্পূর্ণ জনবসতি মুসলমান হয়ে গিয়েছে। রণবীরপুরা অঞ্চল সিন্ধুর দক্ষিণতীরে অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়ানো। রণবীরপুরার পর ছোট দু-ঘরের বসতির একটি চোলি আর তার কাছে স্তম্ভ-না মঠ। এটাও একটা ধ্বংসস্তূপ। টিক্-সে থেকে তেরো মাইলের মতো পথ চলে হাসিম গুম্ফার সামনে সিন্ধুর সেতুর কাছে এসে পৌঁছলাম। সেতুটি কাঠের তৈরি। একবারে একটি ঘোড়াই পার হতে পারে। আমরাও সেই মতো এক এক করে পার হলাম। এবার আমরা লাদাখ থেকে কুলু যাবার রাস্তার ওপরে এসে পড়লাম। কিছু রোপিত বিরি গাছের জটলা, মাটি আর স্তূপের পর একটা ছোট নালা এল। এরপর মন-চে-লঙ্ গ্রাম। নোনো তার এক পরিচিত গৃহস্থের বাড়ি গেলো। বাড়ির ভেতরে ছাগল, ভেড়া আর গাধার প্রস্রাব, পায়খানা আর শরীরের মিলিত দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে বাইরে এসে একটা বিরি গাছের তলায় বসলাম। দেখলাম বিরি গাছে কাশীর কুলের আকারে হাজার হাজার গোল গোল ফল হয়ে আছে। ভলো করে দেখার পর দেখলাম ওগুলো গাছে নয় শুধু পাতায় লেগে আছে। স্থানীয় লোকেরা বলল, ওগুলো কোনো ফল নয়। এক প্রকারের কীট, গাছের পাতায় ডিম পারে তারপর ওই ফলের আকারে গুটি তৈরি করে। কিছুদিন পর রেশমগুটির মতো ওই গুটিগুলি ভেঙে নতুন কীট জন্ম নেয়। গৃহস্থামিনী বললেন— যে গাছে দেবতা বাস করেন, এই ফলগুলো সেই গাছেই একমাত্র হয়। প্রকৃতপক্ষে দেবতা বাস করে এই ভেবে যে গাছ কাটা হয় না তার পাতাতেই এই কীটগুলো ডিম পারে। অন্য গাছগুলোকে প্রতিবছরেই কাঠকুটোর জন্য ছাঁটা হয়। পাতা বেশি থাকে না অতএব এই কীটের গুটি বানাবার প্রশ্নও আসে না। এদিকে অপেক্ষা করতে করতে যখন প্রায় সাড়ে ছটা বেজে গেলো, তখন একজন খচ্চরঙলার দেখা পাওয়া গেলো। জিজ্ঞেস করে জানলাম আমাদের খচ্চরঙলা আজ নাও আসতে পারে। বেচারি নোনো, তাঁর আমার সঙ্গে এ পর্যন্তই আসার কথা। এখান থেকেই সে লেহুতে ফিরবে। এদিকে আকাশ মেঘে ঢাকা। সন্দের দিকে ফোঁটা ফোঁটা বর্ষণও শুরু হলো। ভাগ্য ভালো অন্ধকার পুরোপুরি নামার আগেই মুক্খুরাম তার দলবল সহ পৌঁছে গেলো, মাঠের ফসল কাটা হয়ে গেছে, অতএব বিস্তৃত খালি জমি। সেখানেই মালপত্রের দেয়াল তৈরি করে তাঁবু খাটানো হলো। তাঁবুর এক কোণে আমার বিছানা পড়ল। কাপড়ের ঘেরাটোপে মোমবাতিও জ্বালানো হলো। বিছানায় বসে মনেই হচ্ছিল না যে ঘরে নেই তাঁবুতে আছি। সারারাত ধরেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়েই চলল। তবে লাদাখের বর্ষণকে যারা জানে তারা এই রিমঝিম আওয়াজে বিন্দু মাত্র চিন্তিত হয় না।

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে কপির তরকারি আর রুটি দিয়ে প্রাতরাশ সারা হলো। নোনো তিব্বতী চা বানিয়ে আনল। সাড়ে নটার সময় সে লেহুর দিকে রওনা হলো আর আমি কুলুর দিকে। এবার আমাদের পথ ছিল সিন্ধুর বাঁ-দিক ধরে ওপরের দিকে। দশ মাইল চলার পর প্রথম

যে গ্রামটি পেলাম তার নাম উপ-শি (১১৯০০ ফু:)। এখানে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য সরাইখানা আছে। তবে খচ্চরওলারা সরাই আছে কি নেই তার পরোয়া করে না। তারা একটু সমতল জায়গা পেলেই তাঁবু খাটিয়ে নেয়। উপ-শি থেকে আমাদের সিন্ধুনদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলো। এবারের রাস্তা গ্যনদীর বাঁ-দিক ধরে সেই ওপরের দিকে। এই একশো বিয়াল্লিশ মাইল রাস্তা সংরক্ষণের জন্য কাশ্মীর সরকার বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে। সেই বিরাট অঙ্কটা কত? পাঁচশো টাকা। যা থেকে অর্ধেক আবার ঠিকাদারের পেটে যায়। তার চেয়ে কমে তারই বা চলে কি করে? গ্য পর্যন্ত কোনো না কোনো সরকারি অফিসার প্রতি বছরেই আসে সেজন্য ওই পর্যন্ত কিছু লোক দেখানো মেরামতি হয়। তারপর মেরামতির নামে একটা পাথরকে এখান থেকে সরিয়ে ওখানে রাখা এই পর্যন্তই হয়।

আজকে চলতে চলতে আলোচনা হচ্ছিল আমার দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা নিয়ে। আমি বললাম সকাল দশটার আগে তোমরা রওনা হতে পার না, তারপর যদি আমার খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য রাস্তায় থামতে হয় তাহলে কবে কুলু পৌঁছাব জানি না, অতঃপর কিছু দিশি বিস্কুট (কুলচা জাতীয়), মুরগির দুটো ‘পরম সান্ত্বিক’ ডিম, (পরে ওই বস্তুটির সংখ্যা বাড়িয়ে চার করেছি) কিছু লাদাখী আপেল আর জল, এইটুকুতেই চলতে চলতে দুপুরের আহার হিসাবে মানিয়ে নেব বলে ওদের জানালাম। আজ পর্যন্ত (চিঠি লোখার তারিখ) ওভাবেই চালিয়ে এসেছি। তবে দুঃখের কথা এই যে আজ আর একটি ডিমও অবশিষ্ট নেই।

উপ-শি থেকে আবার চলা শুরু। ছ-মাইল পথ চলে এলাম মি-রুতে। গ্রামের কাছে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল। গ্রামের পাশে খেতের ফসল কাটা হয়ে গিয়ে যে সমতল ভূমি তৈরি হয়েছিল, বৃষ্টির দৌলতে সেখানকার আলগা নরম মাটি একটু পরেই ভিজে কাদা হয়ে গেলো। খচ্চরওলারা রাস্তার ধারে একটা বড় পাহাড় যার খানিকটা খানিকটা ছাতার মতো রাস্তার ওপরে বেড়ে ছিল তার তলায় আশ্রয় নিল। এই গ্রাম সম্বন্ধে লাদাখী প্রবচন আছে— ‘মুখর্-লস্-সঙ-ব-খ-ল-চে। যুল-লস্ সঙ-ব মি-রু-চ’। (মহলের মধ্যে প্রাচীনতম হলে খ-ল-চে আর গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে পুরানো হলে মি-রু-চ)। এই প্রবচনের যথার্থতা গ্রামের ভাঙাচোরা রাস্তা আর এদিক-ওদিকের ধ্বংসস্তূপ থেকেই মালুম হচ্ছিল। গ্রামের বাইরে বুশহরি (উত্তর প্রদেশের একটি জায়গা—রামপুর-বুশহর) ওর্গান (অথবা রামপ্রকাশ)-এর বাড়ি। বাড়িটিকে কুটির বলা চলে না কারণ তার ছাদে খড় বা শণের আস্তরণ নেই। কেবল পাথরের ওপরে পাথর সাজিয়ে দেয়াল, ছাদ গড়া হয়েছে। বুশহরি তার খেতের গম আর গ্রীষ্মের ফসল কাটছিল। খবর পেয়ে দেখা করতে এল। এর আগের বারের লাদাখ ভ্রমণের সময় এবং এবারও হামিস্ গুম্ফার মেলাতে দেখা হয়েছিল। বেচারী এক লাদাখী মেয়েকে বিয়ে করে ঘর-জামাই হয়ে রয়েছে। একটি ছেলে ছিল যে তিন-চার বছর বয়সেই মারা গেছে। এখন স্বামী স্ত্রী দুটি মাত্র প্রাণী। তবে এখনও তারা সন্তান কামনা করে যাচ্ছে। না হলে বংশধরের অভাবে ওই প্রস্থর মহল শূন্য পড়ে থাকবে। হামিসের মেলাতেও সে অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল— গুরুজী, আমাকে একটা ‘যন্তর’ (মন্ত্র) দিন। সেবার কোনো মতে বেঁচেছি কিন্তু এবার আর ছাড়ান নেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে তাকে বললাম, হাতে তৈরি কাগজ যদি বাড়িতে থাকে তাহলে নিয়ে এসো। কাগজ এনে সে বলল— আমার

বউয়ের রাগ বড় বেশি। খেতের কাজ করার সময় কোনো ছাগল ভেড়া চরতে চরতে ঢুকে গেলে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে। গুরুমহারাজ ওর জন্যও একটা 'যন্তর' চাই। আমি কাল দেব বলে চলে এলাম। কাগজটাকে দুটুকরো করে ছিঁড়লাম। একটাতে পুত্র হবার 'যন্তর' লিখলাম বর্ণমালার অক্ষর সাজিয়ে, কোনো মন্ততন্ত্র নয়। রাগ কমাবার যন্তরে ব্রাহ্মী লিপিতে লিখলাম —কোনো মন্ত নেই। যন্তর পাবার আশায় বুশহরি রামপ্রকাশ খুব খুশি। সে ঘোড়ার এবং খচ্চরের জন্য চারা দানা, ইত্যাদি কেনার ব্যাপারে খুব সাহায্য করল। সকালবেলা আমি তার হাতে দুটো 'যন্তর' দিলাম এবং কিছু সংযম বিষয়ক পরামর্শ দিলাম। স্বামী স্ত্রী দুজনের বয়স হলোও কেঁউই বৃদ্ধ নয়। সন্তান জন্মাবার বয়সও পার হয়ে যায়নি। অতঃপর যদি তাদের সন্তান হয় তাহলে আমার 'যন্তরের' মহিমাই ধ্বনিত হবে। গতকাল সন্দের সময় যবের সন্তুর সরবত এসেছিল খাওয়া হয়নি। আজও গেলাস ভরা সেই সরবত এল। ফেরালাম না। সকালে প্রাতরাশও ভালোই হলো। যদিও সকালে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়া বন্ধ ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গী খচ্চরওলাদের বাদশাহী মেজাজ। তারা তখন কলকে ভরে দম নিতে ব্যস্ত। একদিকে রুটি তৈরির কাজ চলছে, অন্যদিকে গল্পগুজব, আড্ডা চলছে। বেশ খানিকক্ষণ পর দেখি খচ্চরের পিঠের ঢাকা সরিয়ে, কিছুক্ষণ তার শরীরে দলাইমালাই করে স্বাভাবিক রক্তচলাচলের অবস্থায় এনে, তারপর তাদের সাজ পরানোর কাজ শুরু হলো। খচ্চরের শিরদাঁড়ায় যাতে বেশি চাপ না পড়ে বা আঘাত না লাগে, সেজন্য লম্বা কাপড় ভাঁজ করে পুরু প্যাডিং মতো তৈরি করে খচ্চরের পিঠে রাখা হলো। আবার পেট চেপে আরেকটা কাপড়ের পট্টি বাঁধা হলো। প্রত্যেকটি খচ্চরকেই এভাবে আলাদা আলাদা করে সাজ পরানো হলো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কলকেতে দম দেওয়া অবশ্য চালু ছিল। এই সব করতে করতেই সাড়ে এগারোটা বেজে গেলো। আমি বললাম— আমার দুপুরের খাবারটা নিয়ে এসো, এখানেই ও পাট চুকিয়ে দিই।

২০ সেপ্টেম্বর বেলা বারোটায়ে আমাদের কাফেলা রওনা হলো। কিছুদূর চলার পর দেখলাম নদীর উপত্যকা ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে। পথে দুটো বাড়ি পড়ল, আর বোধ হয় শেষ বারের মতো সফেদা ও বিরি গাছ দেখলাম। সাত-আট মাইল চলার পর গ্য গ্রামের খেত-খামার, বাড়িঘর দৃশ্যমান হাত লাগাল। এখানে একটাই গ্রাম এবং অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো, গ্রামটির উচ্চতা সমুদ্র তট থেকে তেরো হাজার পাঁচশো ফিট। এখানে এই উচ্চতার জন্যই বড় বড় কোনো গাছপালা নেই। খেতে প্রচুর গ্রিন ফলেছে। জায়গায় জায়গায় সাদা রং করা মানি আর স্তূপ রয়েছে। গ্য গ্রামে একটি সরকারি অতিথিনিবাস এবং যাত্রীদের অর্থের বিনিময়ে দেবার জন্য একটা শস্যগুদাম আছে। বিক্রমশিলা বিহারের ভূতপূর্ব শিক্ষার্থী এবং আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য গ্য-চোন্-ড-সেঙ-গে (গ্যংবালা বীর্যসিংহ) এখানকারই অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর গুরুর সঙ্গে তিব্বতে যাবার পথে, নেপালেই দেহ রাখেন এবং তাঁর মৃত্যুতে আচার্য দীপঙ্কর অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে একটা উঁচু জায়গার ওপরে বেশ খানিকটা সমভূমি আছে। সেখানে প্রচুর সংখ্যায় প্রাচীন স্তূপ রয়েছে। ওখান থেকে আরও মাইল তিনেক চলার পর নদীর বাঁ-দিকে একটু ওপরে উঠে পুরানো এক সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। স্তূপ দিয়েই সংঘারামটির প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল এবং সেইজন্য এখানে প্রায় শতাধিক স্তূপ দেখতে পেলাম। স্তূপের অধিকাংশ

নষ্ট হয়ে গেলেও কয়েকটি স্তূপ তাদের ভগ্ন দশা সত্ত্বেও মাটিতে খাড়া থেকে আপন অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাল। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর আগে তিব্বত এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে সমস্ত বিহার বা সংঘারাম পাহাড়ের দুর্গম স্থানে নির্মিত না হয়ে সমতল ভূমিতে নির্মিত হতো এবং বিহারগুলি অবশ্যই প্রাচীর বেষ্টিত হতো।

এখান থেকে দু-মাইল দূরে নদীর ডানদিক ধরে চললে একটা ছোট জলধারা বা নালা পড়ে, তার কাছেই তি-রি গ্রাম। এখানকার একটি স্তূপ সম্পর্কে কিংবদন্তি আছে যে সম্রাট অশোক যে চুরাশি হাজার স্তূপ দেশে বিদেশে নির্মাণ করেছিলেন, এটি তারই একটি। এখান থেকে উপত্যকা ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে। লাদাখ অঞ্চলের অস্তিত্বমতম গ্রামটিকেও আমরা পেছনে ফেলে এলাম। এখন চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ে পাথরের চেয়ে মাটির ভাগ বেশি। সন্ধ্যার সময় আমরা আমাদের বিশ্রামস্থলে পৌঁছালাম। এই জায়গাটা স্তূপ-লঙ-লা থেকে চার-পাঁচ মাইল নিচে। আমাদের সঙ্গী হোসিয়ারপুরের কুম্ভকার জায়গাটার নাম বলল—কোটলা। তবে এদের নামের ওপরে ভরসা করা যায় না। এরা নিজেদের সুবিধা মতো সমস্ত নামকে ভেঙে চূরে ষিক্ত করে উচ্চারণ করে। যেমন মর-চে-লঙ কে এরা মিরচিলং বলে। মর-চে-লঙ শব্দ এদের কাছে কোনো বিশেষ অর্থ বহন করে না কিন্তু মিরচির বেশ কিছু ভূমিকা তাদের জীবনে আছে। এভাবেই লা-চা-লঙ হয়েছে লোগলাচা। আগে আবার বড় লাচা আছে সেগুলোকে বড় এলাইচি, ছোট এলাইচি ইত্যাদি নামে ডাকে। এভাবে স্থানীয় নামের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তারা সমস্ত মশলার নাম বলে যায়। বিশ্রামস্থলে তাঁবু খটানো হয়ে গিয়েছিল। আমার বিছানাটিও নির্দিষ্ট জায়গাতে পাতা হয়েছিল। একে তো পথ চলার ক্লান্তি তার ওপরে আলো কম থাকায় কোনো লেখালেখির কাজ করতে পারব না। অতএব শুয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঠান্ডার কথা কি আর বলব। দুটো উলের গেঞ্জি, একটা উলের সোয়েটার তার ওপরে পশমিনার চাদর দুভাঁজ করে চড়ানো। এরও পরে কাশ্মীরী বালাপোশ তার ওপরে প্রায় সের দশেক ওজনের চমরির লোম দিয়ে বোনা কশ্বল, সর্বোপরি আবার একখানা দুভাঁজ করা কাশ্মীরী বালাপোশ। পায়ে মোটা মোজা। হোস তো ছিলই। এরপরও যদি ঠান্ডার অভিযোগ করি তাহলে যেগুলো গায়ে চাপিয়ে রাত্রিতে শুয়েছিলাম, তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। ২২ সেপ্টেম্বর সকালে উঠলাম। জলে হাত দিয়ে মনে হলো হাত কেটে পড়ে যাবে, এত ঠান্ডা। অনেক কষ্টে হাতমুখ ধোয়া হলো। নটার মধ্যে জলখাবার তৈরি। এরপর খচ্চরদের, সাজসজ্জার পালা। সওয়া এগোরোটা নাগাদ আমাদের কাফেলা তার ডেরাডাস্তা তুলল। আজকে যে গিরিসংকট বা 'লা' পার হব তার নাম স্তূপ-লঙ-লা (১৭৫০০ ফিঃ)। আমার সঙ্গীরা সকলেই যদি লাদাখী হতো তাহলে তারা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হতো। প্রথম দু-তিন মাইলের চড়াই বিশেষ কষ্টকর ছিল না, তারপরই শুরু হলো কঠিন চড়াই। মানুষ এবং পশু সকলেই দশ পা এগোয় আর বড় বড় করে শ্বাস নিতে থাকে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল— স্বামিজী, কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? বললাম— ভাই অন্যের পিঠের ওপরে আছি, যার পিঠ তার কষ্ট নিশ্চয়ই হচ্ছে। এদিকে ওদিকে কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে বরফ পড়ে ছিল। অবশেষে আমরা উঁচু শিখরে উঠলাম। খচ্চরগুলাদের যেন ধড়ে প্রাণ এল। না কোনো পশুই পড়ে নেই। শিখরে উঠে দূরে ছো-মো-রি-বির বিশাল ক্ষার সরোবর দেখতে পেলাম। এবার শুরু উতরাইয়ের। দু-মাইল পর্যন্ত

উতরাই পর্ব চলল। তারপর এল দব্-রিঙ অর্থাৎ বড় ময়দান। একটা ময়দান বা সমতল ভূমি শেষ করে বাঁ-দিকে ঘুরে দেখলাম আর একটি ময়দানের আরম্ভ। এই ময়দানের জল, তা সে বৃষ্টিরই হোক কিংবা তুষার গলে, কোনো নদী, নালা বা হ্রদে পড়ে না। সবটাই এই বিস্তৃত সমতল ভূমি নিজেই শুষে নেয়। এবছর লাদাখ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এই সব ময়দানে বেশ ভালোই ঘাস জন্মেছে। এক জায়গায় দেখলাম একদল কিয়াঙ (বুনোগাধা) দাঁড়িয়ে আছে। এক লাদাখী আমাকে বোঝাল যে ওগুলো খচ্চর। হোসিয়ারপুরী সঙ্গী বলল ওগুলো জংলি ঘোড়া। আমি বললাম কিন্তু লেজ দেখলে তো মনে হয় গাধা। তবে যে ধরনের গাধা আমরা সচরাচর দেখে থাকি ওগুলোর আকার তার চেয়ে বড়। পনেরো হাজার ফিটের বেশি উচ্চতায় রুম্প-ও অঞ্চলের এই ময়দানী এলাকায় প্রায়শই কিয়াঙদের চরতে দেখা যায়। সূর্যাস্তের সময়ে আমরা রোক-ছন্ গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে তাঁবুতে বাস করা চঙ-পো সম্প্রদায়ের এক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। দেখে মনে হলো তাঁবু দিয়েই একটা গ্রাম তৈরি হয়ে গেছে। নদীর বাঁ-দিকের কিনারায় আমাদের কাফেলার ডেরা পড়ল। খচ্চরদের ধরাচুড়ো খুলে একটু ওপরে চরতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

২২ সেপ্টেম্বর ভোরে উঠলাম। ঠান্ডা এখানেও যথেষ্ট। খাওয়া দাওয়া সেরে বেরোতে বেরোতে বেলা এগারোটা বেজে গেলো। কাল পর্যন্ত লেহ্ থেকে লাসা এবং লেহ্ থেকে কুলু একই পথ ছিল এবং আমরা সেই পথেই চলেছি। কিন্তু সন্ধ্যা বেলাতেই দেখলাম দুটো পথ আলাদা হয়ে দুদিকে চলে গেছে। আজ বারো মাইল পথ চলা হয়েছে সম্পূর্ণ ময়দানী এলাকা দিয়ে। কোথাও কোথাও দু-চারটে কিয়াঙকে চরতে দেখেছি যারা মানুষের আওয়াজ পেলেই কান খাড়া করে সতর্ক হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও কোথাও গর্তের মধ্য থেকে মুখ বার করে থাকা হিমাচলি ইঁদুর (সঙ্গীরা ওগুলোকে ইঁদুর বলার জন্যই জেদাজেদি করতে লাগল) না হলে ওগুলোকে দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের উদ্বেড়াল বা ভৌদরের মতো। এদের আকার অবশ্য ইঁদুর এবং ভৌদর দুজনের থেকেই বড়। আমাদের পদশব্দ পেতেই প্রাণীগুলো গর্তে ঢুকে গেলো। এই ময়দানে কোনো গাছপালা নেই, যা আছে তা হলো কিছু ঘাস আর মাটির সঙ্গে লেগে থাকে এক ধরনের কাঁটা গাছ। আজ আমি আমার ঘোড়াকে নিয়ে দলছুট হয়ে খানিকটা এগিয়ে এগিয়ে চলছিলাম।

ময়দানের একেবারে শেষের দিকে একটা মেষপালক ছেলে অনেকগুলো মেষ হাঁকিয়ে নিয়ে চলছিল। জিজ্ঞেস করায় সে বলল—গবজা (লাহুল) যাচ্ছ। শেষ দিকে ময়দানটা হঠাৎ যেন ঢালু হয়ে একটা উতরাইয়ের মতো হয়ে নিচে নেমে গেছে। উতরাইটা যথেষ্ট খাড়া। আমি ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলাম। আমার পায়ে নম্দের (উঠের লোম জমিয়ে তৈরি কাপড়) মোজা তার ওপর আবার ইয়ারকন্দী চুরোক ছিল। যার জন্য মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছিল। কোনো মতে নামতে নামতে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। এই জায়গার উচ্চতা পনেরো হাজার ফিটের বেশি। এখানে খানিকটা অপেক্ষা করতেই আমার সঙ্গীরা এসে পড়ল। যদিও এখন পর্যন্ত সতেরো মাইল চলা হয়েছে তবু আজ আরও কিছুটা পথ চলার সিদ্ধান্ত হলো। এখানে তিনটি নদী আমাদের পার হতে হবে। সামনের নদী পার হয়ে খানিকটা এগোতেই দ্বিতীয় নদী। সেটাকে পার হওয়া গেলো। এরপর এল তৃতীয়টি এবং তারই কিনারায় অবস্থিত লা-চা-লুঙ জোতাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। যে তিনটে নদী আমরা পরপর পার হলাম সেই তিনটি নদীই খানিক

এগিয়ে পরস্পর মিলিত হয়েছে এবং সেই ত্রিধারা আরও এগিয়ে একটি বড় নদীতে বিলীন হয়েছে। সেই নদীটি আবার প্রবাহিত হয়ে লেহর আঠারো মাইল নিচে নীমুর কাছাকাছি সিঙ্গুনদে পড়েছে। মাইল ছয় আরও চলার পর আজকের মতো যাত্রা বিরতি ঘটাবার সিদ্ধান্ত হলো। লা-চু-লুঙ নদীর বাঁ-দিকের তটভূমিতে আমরা ডেরা ফেললাম।

২৩ সেপ্টেম্বর সকালবেলা উঠে দেখি, নদীর জলে স্রোত যেখানে কম, সেখানে অনেক বরফ জমে আছে। আজ সঙ্গীদের মধ্যে বেশ তৎপর ভাব লক্ষ্য করলাম কারণ আজকের যাত্রা পথ বেশ কঠিন। সকাল সাতটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়া হলো। সকাল সাতটা অবশ্য আমার ঘড়ি দেখে বলছি। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহরে আঠারো মার্ক দিয়ে কেনা এই ঘড়ি এমনিতে সময় ভালোই দিচ্ছিল। হ্যাঁ ঠান্ডা গরমে কিছু ফার্স্ট স্লো অবশ্য হতো। লেহুতে একদিন ঘড়িটার কাঁচ গেলো ভেঙে। একটা টাকার বিনিময়ে এক অকর্মার ধাড়ি ঘড়িওলা অনেক ঠেসে ঠুসে একটা কাঁচ বানিয়ে দিয়েছিল সেই সঙ্গে নি-খবচায় ঘড়ির মধ্যে একটা চুলও ভরে দিয়েছিল। চুল আর পশম লাদাখে সর্বব্যাপী বস্তু। খাবার নুনের মতোই এদের অপরিহার্য মনে হবে। ব্রহ্মচারী গোবিন্দ একদিন এক টাকার মাখন কিনেছিল, পরে বলল— টাকাটা কিসের জন্য দিলাম, মাখনের জন্য না পশমের জন্য? যাইহোক, সেই অযাচিত কেশটি আমার ঘড়ির ভেতরেই আশ্রয় নিয়ে রইল। এবং ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে তার কাছে এলেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ঘড়ি তখন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কাঁটা জোর করে আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে এগোতে থাকে ঘড়িও চালু হয়ে যায়। ঘড়ির ওই বন্ধ থাকার সময়টাতে আন্দাজে সময়ের হিসেব করতে হয়। যাইহোক, ধরে নেওয়া যাক যে সকাল সাতটায় রওনা হয়েছি। প্রথম চড়াইটা ছিল মিষ্টি। আমার সঙ্গীরা চড়াই উতরাইয়ের কঠিনতার বিচারে কারও আগে ‘মিষ্টি’ অথবা ‘তেতো’ বিশেষণ যোগ করে। তবে একটু এগোতেই কয়েক ফার্লঙের ‘তেতো’ চড়াইও এসে গেলো। ব্যাস, তারপর থেকে জোত পর্যন্ত ‘মিষ্টি’ চড়াই ছিল। স্তম্ভ-লুঙ জোতের উচ্চতা ষোলোহাজার দুশো ফিট। বাতাস এখানে এত হালকা যে শরীর নাড়তেও যেন ভীষণ পরিশ্রম হয়। তিব্বতীরা এর কারণ হিসাবে বলে এখানকার মাটি বিষাক্ত, তাই অমন হয়। ভারতীয়রা অধিকাংশই বিষাক্ত জড়িবিউটির ওপর দায় চাপায়। আমার এক সঙ্গী স্তম্ভ-লুঙে গন্ধকের আধিক্যের কথা বলছিল। উচ্চতার হিসাব তারা আশপাশের মাটি দেখে করে। সেজন্যই তারা বলছিল যে ল-চো-লুঙ স্তম্ভ-লুঙের চেয়ে বেশি উঁচু। তাই যদি হবে তাহলে স্তম্ভ-লুঙে এত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কেন? সমুদ্রতট থেকে উচ্চতার হিসাব এখনও এদের অজানা। আজ ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই চারটে ডিম আর দুটো আপেলের ফলাহার হলো। এই যাত্রায় মধ্যাহ্নভোজে ফলাহারকেই নিয়ম করে নিয়েছিলাম। যদি দুধ ফলাহারের মধ্যে পড়তে পারে তবে ডিম নয় কেন? তার জন্য তো ফুকো ব্যবহার করতে হয় না, বাছুরকে অভুক্ত রেখে মারতেও হয় না। রামনাম জপতে জপতে জোতের শিখরদেশে গিয়ে পৌঁছলাম। দুটো ভারবাহী পশুর মধ্যে ক্লাস্তি এবং দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। কিন্তু কোনো বলিদান দিতে হয়নি। স্তম্ভ-লুঙে একটা পঁচিশ টাকা দামের গাধার দম ফুরিয়ে এসেছিল, কোনোমতেই আর চলতে পারছিল না রোগ-ছেনের আগে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। এই পথে যাতায়াতকারী স্থানীয় কোনো লোকের চোখে পড়লে সে ওকে নিয়ে যাবে না হলে রাত্রিতে নেকড়েদের মহাভোজের উপকরণ হবে।

এবার উতরাই প্রথমে সাধারণ, তারপর সামান্য চড়াই। ফের তিন সাড়ে তিন মাইলের

‘মিঠাউংরাই। তারপর মাইল দেড়েক ‘তিক্ত’ অর্থাৎ খাড়া উতরাই। এরপর আমাদের রাস্তা চে-র নদীর ডানদিক ধরে। আমার সঙ্গীরা হলফ করে বলল, এই নদী কার্গিল পর্যন্ত যায়, সেখান থেকে দ্রাস নদীতে পড়ে এবং পরে তা সিন্ধুতে গিয়ে মেলে। কিন্তু মানচিত্র বলছে, এটা জাংস্কর নদীতে গিয়ে পড়ে সেখান থেকে লেহর নিচে নি-মুর কাছে সিন্ধুতে গিয়ে মেশে। আর দু-তিন মাইল চলে সেদিনের মতো যাত্রা বিরতি হলো। রাত্রিতে নদীর ধারে ঘোড়া-খচ্চরদের চরবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো। জনাচারেক সঙ্গী চা, আটা আর মাংস নিয়ে কোথায় যেন শুতে গেলো। ভোর বেলা দেখি তারা ফিরে এসেছে সঙ্গে চারটে সাদা রঙের কাঠের বোঝা।

২৪ সেপ্টেম্বর তৈরি হতে হতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেলো। আমি সঙ্গীদের অনুরোধ করে বললাম, এখন থেকে তোমরা বারোটার পরই রওনা হও, আমিও তাহলে একটু নিশ্চিন্তে খাওয়া দাওয়া সারতে পারি। একটু লেখালিখির কাজও করতে পারি, রাত্রিতে আলোর অপ্রতুলতার কারণে ওটা তো করে ওঠা হয় না, তবে বড় লাচা পার হয়েই এসব হবে। চার-পাঁচ মাইল চলার পর বাঁ-দিক থেকে বয়ে আসা একটা ছোট নদীর দেখা পেলাম যেটা কাংড়া জেলা আর কাশ্মীর রাজ্যের সীমাকে ভাগ করেছে। নদীর এদিকে সীমান্ত নির্দেশক স্তম্ভ পৌঁতা আছে। নদীতে সামান্য জল ছিল। আমরা এই নদীটাকেই দু-জায়গায় দু-বার পার হয়ে একটা লম্বা উতরাইয়ের হাত এড়ালাম।

এবার আমাদের যেতে হবে ‘চে-র’র নদীর শাখা যু-লন নদীর দিকে। যেখানে যু-লন আর চে-র’র পরস্পর মিলিত হয়েছে তার কাছে একটা জলপ্রপাত রয়েছে। জলপ্রপাতের খারাগুলো এক সঙ্গে মিলিতভাবে নদীতে পড়েনি। আলাদা আলাদা ধারায় পড়েছে, যার মধ্যে কোনোটি শীর্ণ আবার কোনোটি বেশ হুটপুট। এক সঙ্গী বলল, এখানে পাণ্ডবেরা যজ্ঞ করেছিল। যজ্ঞ হয়েছিল কিনা জানি না, তবে এই জলপ্রপাতের উৎস স্থলে একটা তীর্থক্ষেত্র অবশ্যই তৈরি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে কজন যাত্রী আসবে? আর কিভাবেই বা আসবে? অতএব এখানকার স্থান মাহাত্ম্য কিংবদন্তিতেই আটকে আছে। যু-লন নদীর ডান দিক ধরে আমরা ওপরে উঠছিলাম। এদিকটা যে ব্রিটিশ ভারতের অংশ তা কেউ না বলে দিলেও বোঝা যাচ্ছিল। কারণ এখানকার রাস্তা যথেষ্ট মেরামত করা এবং প্রতি ফার্লঙ হিসাবে দূরত্ব বোঝাবার জন্য রাস্তার ধারে ধারে প্রস্তর ফলক বসানো। প্রথম মাইলস্টোনে দেখলাম কুলু একশো কুড়ি মাইল। আরও কিছুটা চলে নদীর ধারে বেশ বিস্তৃত ময়দান পাওয়া গেলো। প্রথমে ময়দানের মধ্যে দু-একটা স্তূপ চোখে পড়ল, কাছেই একটা ছোট টিলার ওপরে স্তূপ ও মানি দুটোই দেখতে পেলাম। নোনো গোর্গান আমাকে আগেই বলেছিল যে আগে কুলু রাজ্যে আর লাদাখের সীমানা ছিল ফো-লঙ ডন্ডা। যেখানে একটা পাথরে এ বিষয়ে কিছু লেখাও আছে। আমি ওরকম কিছু পাথর লক্ষ করে চলেছি, ইতিমধ্যে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেলো। বেলা চারটের সময় আমরা একশো পনেরো মাইল নির্দেশক স্তম্ভের কাছে ছিলাম। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে আকাশের এই অবস্থায় আর এগোনো ঠিক হবে না। তাছাড়া আগে বারো মাইলের মাথায় একটা জোতও আছে। জোতের কাছাকাছি অঞ্চলে দারুণ ঠান্ডা পড়বে। যদি একফুট মতো তুষার পড়ে তাহলে সব ঘাস চাপা পড়ে যাবে, ঘোড়া খচ্চররা খাবে কি? অতএব এখানেই ডেরা পড়ুক। এবং ডেরা পড়ে গেলো।



রাত থেকে আরম্ভ হয়ে আজ দুপুর পর্যন্ত একটানা তুষারপাত চলল। আমি গতকাল কিছু ফোটা তুলেছি। গতকাল সন্ধ্যাবেলা হো-য়ুন-এর পারে ঘোড়া খচ্চরদের চরতে ছাড়া হয়েছিল। কালই আমার সঙ্গীরা সবচেয়ে কাছে পাহাড় থেকে গাঁঠরি বেঁধে ঘাস আর জংলি মটর নিয়ে এসেছিল, দু-চারটি মটরের শিষ আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। ফলটা লম্বাটে, মটরের মতোই কিন্তু দানাগুলো ছোট ছোট এবং কালো। ওপারে মাঠের কাছে জঙ্গলে বুনো গমও নাকি পাওয়া যায়। এখানকার ঘাসের তারিফ করে আমার এক সঙ্গী বলছিল যে— চম্বার সঙ্গী (গুজ্জর) আর লাহলের মেষ পালকেরা তাদের ছাগল ভেড়ার পালকে এখানে চরাতে আনে। তাদের কউ কেউ তো এখানকার ঘাস খেয়ে এত মোটা হয়ে যায় যে দেহের বাড়তি মেদমাংস চামড়ার খোলসের মধ্যে আর ধরে না, ফেটে যায়। একথার মধ্যে অবশ্যই অতিশয়োক্তি আছে কিন্তু ঘাসের দীর্ঘতা আর সজীবতায় কোনো সন্দেহ নেই। জংলি মটর এবং গম হয়তো এখানে বহুকাল আগে থেকেই ফলে আসছে। এবং সেগুলোকে দেখেই হয়তো আট ন-হাজার বছর আগের মানুষ চাষ করা শুরু করে। এদিককার পাহাড়ে বুনো ভেড়া ছাগলও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লা-চা-লুঙ জোতের পর কিয়াদ আর দেখা যায় না।

এদিকে আমার একটা ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেলো। যাত্রার শুরুতে কখনও একবার বোধ হয় বলেছিলাম যে পথে এবার তুষারপাত হবে। গতকালের ভারী বরফ পড়া তাকে সত্যি প্রমাণ করে দিয়েছে। এরপর আমার সঙ্গীরা এখন আমার বয়সের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত এবং তাদের ধারণা আমার বয়স কুড়ি-পঁচিশ বছর। আমি তাদের বললাম—বন্ধুগণ এভাবে বয়স কমালে আমি নিশ্চয়ই একশো বছর পর্যন্ত টিকে যাব। গতকাল আমি আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছি যে আগামী চারদিন আকাশ থেকে মেঘ সরবে না। মনে হয় খচ্চরেরাও এখান থেকে নড়তে ইচ্ছুক নয়। এখানকার ঘাসের যা স্বাদ। আমার লেখালিখির জন্যও এটুকু যাত্রাবিরতি মন্দ নয়। রাত্রি সাড়ে তিনটে পর্যন্ত আকাশের গুরুগম্ভীর ভাবের কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না। যদি সত্যি সত্যি আরও দু-দিন এখানে থাকতে হয়, ভাবছি তাহলে দুটো গল্পও লিখে ফেলব। এই চিঠি এখান থেকে দূরে ক-লঙ থেকে ডাকে ফেলব।

আজ সারাদিন ধরে আমার সঙ্গীদের কথপোকথন শুনছিলাম আর আমার এই পর্যায়ের ভ্রমণের দিনলিপি ঠিক করছিলাম। লেহু থেকে আনা ডিম শেষ হয়েছে। এখানে খচ্চরওলাদের চারটি দল আছে। আমাদের দলে রয়েছে চারজন মানুষ। বারোটি খচ্চর দুটো গাধা এবং তিনটি ঘোড়া। শিখদের দলেও চারজন লোক কিন্তু ঘোড়া খচ্চরের সংখ্যা অনেক। আর একটা দলে, বাপ, ব্যাটা আর তাদের এক চাকর। তাদের দলেও প্রচুর ঘোড়া আর খচ্চর এবং একটি গাধা আছে। চতুর্থ দলে একজন লোক আর তার সঙ্গী, দুজন চাকর, একজন ইয়ারকন্দী অন্য জন পাঞ্জাবী। তাদের সঙ্গেও অনেক ঘোড়া, খচ্চর ছাড়া একটি গাধা আছে। তাদের আরও একটি গাধা ছিল সেটিকে স্তগ-লুঙের কঠিন চড়াইয়ে ফেলে আসতে হয়েছে। কথায় কথায় মুখ খারাপ করে গালাগাল দেওয়া এদের স্বভাব। খাবার ব্যাপারে এরা বিশেষ উৎসাহী। বাড়ির চাইতেও সুন্দর রুটি এবং মাংস রান্না করে। প্রতি দুঘন্টা অন্তর চা তো আছেই আর সেই সঙ্গে আছে হাঁকো এবং জমিয়ে আড্ডা। এদের এটাই রোজকার রুটিন। শিখদের দলে এক বৃদ্ধ শিখ আছে যার বয়স প্রায় ষাট-সত্তর হবে। কিন্তু এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও পরিশ্রমের ব্যাপারে সে সকলের চেয়ে এগিয়ে

থাকে। আমার তো তার সঙ্গে ভালোই জমে গেছে। ঘোড়া থেকে নেমেই নম্দের গালিচায় বসে পড়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। তাঁবু খাটানো থেকে, আমার বিছানা তৈরি করা সবই আমার সঙ্গীরাই করে। বিছানা হয়ে গেলে গালচে ছেড়ে তাঁবুতে ঢুকি। বিছানায় বসেই চায়ের পাট সারি। সকালে একদিকে রুটি তৈরি হতে থাকে অন্য দিকে আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে হাতমুখ ধুয়ে, প্রাতরাশ খেতে আসি।

হ্যাঁ, একটা ঘটনা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে। খচ্চরওলারা লাদাখীদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে। কথায় কথায় তাদের মা-বোন তুলে গালাগালি দেয় আর ভোটা ভোটা বলে ডাকাটা তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। তবে রক্ষা এইটুকু যে ওরা সব কথা বোঝে না। একটা ঘটনার কথা বলি, যখন আমরা লা-চা-লুঙ এর ওপারে ছিলাম, তখন রাত আটটা-নটার সময় এক লাদাখী পথিক আমাদের ডেরা দেখে আশ্রয়ের জন্য এসেছিল। বেচারি না বোঝে আমাদের কথা, না পারে বোঝাতে তার কথা। তবুও যতদূর বুঝেছিলাম যে তাঁবুতে নয় বাইরে কোথাও থেকে রাত কাটাতে চায়। কিন্তু তাকে গালাগাল দিয়ে, লাঠিপেটা করার ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সকলেরই একই মনোভাব দেখে আমি কিছু বলতে পারিনি, কিন্তু মনে মনে প্রচণ্ড দুঃখ হয়েছিল। আমার সঙ্গীরা বলল—লোকটা চোর। ওর অন্য সঙ্গী-সাথীরা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি শুয়ে পড়লাম। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলাম চারজন ভোটিয়া চোর আমার বাস্টটাকে তুলে নিয়ে চলে গেলো যার মধ্যে আমার ভোট ভাষার বই ছাড়া ‘মল্লিমনিকায়’-এর হিন্দী অনুবাদ রয়েছে। ওগুলো আমার তিন মাসের পরিশ্রমের ফল, অথচ চোরদের কোনো কাজেই লাগবে না। অবশেষে ঘুমের মধ্যেই কাত হয়ে গেলে, হাত বাস্তের ওপরে পড়ল আর আমার ঘুম ভেঙে গেলো। পরদিন তিন মাইল চড়াই ভাঙার পর দেখি সেই লাদাখী পথের এক ধারে বসে চায়ের জল গরম করছে। এই ধরনের ঘটনাই দুটো জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরস্থায়ী বৈরিতার কারণ হয়ে ওঠে।

কুলু

২.১০.৩৩

প্রিয় আনন্দজি

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় এখানে এসে পৌঁছেছি। এবার আপনাকে বাকি যাত্রা পথের বিবরণী শোনাই। আগের চিঠিতে যেখানে বিরতি টেনেছিলাম, সেখানে থেকেই শুরু করছি।

ফোল্ড-ডন্ডার ছাউনি দুদিন ছিল। চারদিন পর্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে পরিষ্কার হবে না, আবহাওয়া সম্পর্কিত আমার পূর্বাভাস এরকমভাবে মিলে যাবে ভাবিনি। দুদিনেই সকলে হাঁফিয়ে উঠল, বিশ্রামের একঘেষেই আছে, কত আর ভালো লাগে। ২৬ সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটায় আমাদের কাফেলা আবার চলা শুরু করল। প্রথম চড়াই তেমন কিছু কঠিন ছিল না। পাঁচ মাইল চলার পর প্রথম বিশ্রাম নেবার জন্য থামা হলো কুলুতে। এখানে তীব্র তুষারপাতে পথ হারিয়ে ফেলা যাত্রীদের জন্য একটা ছোট মতো ঘর আছে। পাশেই ছোট একটা শ্রোতধারা। ধারার পুল ভেঙে যাওয়ায় ঘোড়াদের জলের মধ্য দিয়েই পার করতে হলো। কোনো অসুবিধা হয়নি, কারণ এখন শীতের সবে শুরু। জলের মধ্যে বরফের আস্তরণ এখন অনেক পাতলা হয়েছিল।

এরপর সামান্য কিছু চড়াই। আশপাশে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওপরের পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পাথর নানা ধরনের অবিন্যস্ত স্তূপ তৈরি করেছে। যদি কোনোক্রমে তার ফাঁক-ফোকরের মধ্যে কোনো ঘোড়া বা খচ্চরের পা আটকে যায়, তাহলে তার হয়ে গেলো। এজন্যই খচ্চরওলারা বরফের রাস্তায় চলতে ভয় পায়, কারণ পাথরের ফাঁক-ফোকর পাতলা বরফে ঢেকে যাওয়ায় বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তার ওপরে যদি বরফ এমন মাত্রায় পড়ে যে পথ-বেপথ সব একাকার হয়ে যায় সে অবস্থায় চলার অর্থ প্রাণ হাতে করে চলা। চড়াই শেষ হতে খানিক দূর পর্যন্ত আমরা একটা ধারায় বাঁ-দিক ঘেঁসে চললাম। এবার আমাদের বাঁ-দিকে প্রায় মাইল খানেক বিস্তৃত একটা ঝিল পড়ল, স্থানীয় লোকেরা যাকে বলে বুন-ছো। ঝিলের অনেকটা অংশ শুকনো দেখলাম। তবে বর্ষায় নিশ্চয়ই সবটাই ভরে যায়।

এবার একটু একটু বরফ পড়ছিল। একশো পাঁচ মাইলের মাথায় কিছু বরফ রাস্তার ধারে ধারেও দেখতে পেলাম তবে রাস্তার মধ্যে তেমন কিছু নয়। কিন্তু যতই এগোই ধীরে ধীরে তার পরিমাণও বাড়ছে দেখলাম। একশো চার মাইলের মাইলস্টোন থেকে প্রকৃতপক্ষে আমরা বরফের ওপর দিয়েই হাঁটছিলাম। ওপর থেকে সাদা সূঁচের মতো বরফ পড়েই চলেছে। আগে মালপত্র নিয়ে খচ্চরের দল, তার পিছনে আমরা পাঁচজন ঘোড়া আর খচ্চরের পিঠে বসে। মনে হচ্ছিল বড় লাচার দিকে বিয়ে বাড়ির বরযাত্রী দল চলেছে। যদিও এখানে চড়াই তেমন ছিল না তবু মনে রাখতে হবে যে আমরা প্রায় ষোলো হাজার ফিট ওপর দিয়ে চলছিলাম। এত উঁচুতে বাতাস পাতলা হয়। ঘোড়া খচ্চরেরাও দীর্ঘ শ্বাস নিচ্ছিল। জোতের দিকে এগোতে এগোতে হিমবর্ষা আরম্ভ হয়ে গেলো। চারদিকে শুধু সাদা বরফ আর বরফ। বরফ ছাড়া বিশ্ব সংসারে আর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছিল না। সারা শরীর নানা রকমভাবে ঢেকে ফেলেছিলাম কিন্তু অসুবিধা ঘটাচ্ছিল চোখ দুটো। এমনিতেই বরফের ওপর দিয়ে বেশিদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছিল না, এখন চোখেও গুড়ি গুড়ি বরফ পড়তে লাগল। জোতের কাছে পাথরের স্তূপ আর লাল হলুদ পতাকা ঝাপসা মতো দেখতে পেয়েছিলাম। তখন মনে ভরসা এল, যাক এবার চড়াই শেষ। এবার বরফের ওপর দিয়ে চলার পথও অর্ধেক মাত্র রইল।

জোতের কাছেই একটা ছোট মতো প্রাচীর ঘেরা বাড়ি আছে। মনে হয় যাত্রীদের আশ্রয় নেবার জন্য তৈরি হয়েছে। এরপর উতরাইয়ের শুরু এবং বেশ সহজ উতরাই, তবে এই বিস্তৃত বরফের এলাকায় খচ্চরেরাও দু-একবার পথ ভুল করছিল। কিছুক্ষণ উতরাইয়ের পর সরোজদলের ঝিল এল। লোকে এটাকে পাতালফোঁড় ঝিল বলে। জলের রং কালো, দেখে মনে হলো ঝিলটি সম্ভবত খুবই গভীর, তবে জল খুব বিস্তৃত নয় সীমিত এলাকায় সীমাবদ্ধ। আমরা ঝিলের এক কিনারা থেকে অন্য কিনারায় এলাম। হঠাৎ কানে এল জলদি জলদি। আমি আমার ভাবনার মধ্যে ছিলাম। আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি আগের খচ্চরটি একটা জায়গা পার হয়ে যেতেই প্রায় আটসের ওজনের তিন-চারটি পাথর গড়িয়ে ওপর থেকে পড়ল। আমি পাহাড়ের দিকে তাকালাম, সেখানে পাতলা বরফের আচ্ছাদনে ঢাকা মাটি থেকে আলগা হওয়া অনেক পাথর। মাঝে মধ্যে সেখান থেকে পাথর যেভাবে খসে খসে পড়ছে তাতে পাহাড়টিকে আমার জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল এবং এই ভাবনা সেই মুহূর্তে মোটেই অতিশয়োক্তি ছিল না। সত্যি সত্যি গায়ের লোম

খাড়া হয়ে ওঠার মতো দৃশ্য। একজন সঙ্গী বলল, এর আগে একবার খচ্চরটি পার হয়ে যেতেই এমন একটা পাথর গড়িয়ে এসে পড়েছিল যে পিছনের খচ্চরটি কিছুতেই তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। খচ্চরটির পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় সে হাঁটার ক্ষমতা হারিয়েছে। বাধ্য হয়ে সেই খচ্চরটিকে ছেড়ে আসতে হয়। পাথরের পড়ার ধরন দেখলে মনে হয় কেউ যেন ওপরে বসে, থেকে থেকে ইচ্ছে মতো ঢিল ছুঁড়ছে। প্রাচীন চৈনিক যাত্রীদের বিশ্বাস ছিল এবং এখনকার অনেক যাত্রীরাও বিশ্বাস করে যে পাহাড়গুলোতে যে-সব দেবতারা বাস করেন, মাঝে মাঝে তাঁরাই ক্রুদ্ধ হয়ে পাথর ছোঁড়েন। যাইহোক, খানিকটা শ্বাস নিয়ে আর খানিকটা বন্ধ করে, মনে মনে পাহাড়ের দেবতার উদ্দেশ্যে অনেক মানত-মিনতি করে ওই সজীব পাহাড়ের পথটাকে পার করলাম। এরপর আবার উতরাই এবং খুবই সহজ। এতক্ষণে হিমবর্ষার বেগও কমে এসেছে। চারদিকের বিস্তৃত বরফের ফরাসের আয়তনও কমে আসছে। একশো মাইলের মাইলস্টোন পর্যন্ত বরফ আমাদের পিছু ছাড়েনি। এখন আমাদের চলার পথ ছিল চেনাব নদীর এক শাখা ভাগা নদীর ডান দিক ধরে। দূরের পাহাড়ে সবুজ ঘাস আর একরকমের লাল রঙের ফুল ফুটে আছে দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বড় কোনো গাছপালা সেখানে ছিল না। দূর থেকে নদীর ওপরে একটা কাঠের সেতু দেখা গেলো। সঙ্গীরা বলল ওর কাছেই রয়েছে জিঙ্-জিঙ্-বড্ এর ছাউনি। এপথের যাত্রীরা ওখানেই বিশ্রাম নেয়। তবে আমরা পর-সেব-এ থাকব। জিঙ্-জিঙ্-বডের লোক এটা আশা করেনি যে, তাদের ছাউনি পেরিয়ে আমরা অন্যত্র রাত্রিবাস করব। পুল পার হবার পর বেশ ভালো রাস্তা পাওয়া গেলো। আমি আমার ঘোড়ার গতি একটু বাড়লাম। ভাবলাম এই পিঁপড়ের চালে না চলে আগের ছাউনিতে থাকা ভালো। কঠিন উতরাইয়ে ঘোড়াকে মন্দ গতিতে চালাতাম, আবার রাস্তা ভালো হলে, ঘোড়াকে দৌড় করাতাম। এভাবে চলে যখন আমি জিঙ্-জিঙ্-বডের শ্লেট পাথরে ছাওয়া সরাইতে পৌঁছলাম তখন দেখলাম বেলা শেষ হতে এখনও অনেক দেরি আছে। অতএব এবার আমি পর-সেব-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আশা ছিল যে দিনের আলো থাকতে থাকতে পর-সেব পৌঁছে যাব। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। মাইল ছয়েক চলার পর ঘোড়ার বাঁ-দিকের রেকাবের চামড়া গেলো ছিঁড়ে। একটা রেকাবের ভরসায় ঘোড়া ছোটানোর হিম্মত ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। কিছুক্ষণ খুব ধীরে ধীরে সাবধানে চলতে লাগলাম। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে, আকাশেও মেঘের ঘনঘটা, এরকম অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে ঘোড়া এবং আমার দুজনেরই পা ভাঙার যথেষ্ট সম্ভাবনা, অতএব একরকম বাধ্য হয়েই একটা রেকাবের ওপরে ভরসা রেখে ঘোড়া ছোটলাম। তা সত্ত্বেও যখন পর-সেব গিয়ে পৌঁছলাম তখন অন্ধকার এতই ঘন হয়ে গিয়েছিল যে লাল আর কালো রঙের সুতোর মধ্যে তফাত করতে পারছিলাম না।

পর-সেব এক জনমানব শূন্য স্থান। শ্রাবণ মাসে এখানে এক মেলা বসে। সেই মেলায় কুলু, লাঙ্ল, স্পিতী, লাদাখ, জাংস্কর এবং তিব্বত থেকে অনেক লোক আসে। মেলায় ফসল, উল, ছাড়াও ঘোড়া, খচ্চর, মেঘ, ছাগল এবং গাধা কেনা-বেচা হয়। ভাগা নদীর বাঁ-দিকে একটা ডাকবাংলো ও একটা সরাই আছে, আবার ডান দিকেও একটা সরাই আছে। নদীর ওপরে সেতু আছে। আমি সেতু পার হয়ে ডান দিকের সরাইটিতে গেলাম। দেখলাম সেখানে দুজন লাঙ্লী নবযুবক রয়েছে। তাদের একজন চা তৈরিতে ব্যস্ত অন্যজন ভেড়ার পশমের ঝাড়াই বাছাই করছে।

আমার ওখানে আসাটা যে কোনো কারণেই হোক ওদের ভালো লাগেনি। আমি তাদের বললাম— আমার সঙ্গীরা এলেই আমি চলে যাব। এই বলে ঘোড়াটাকে এক কোণে বাঁধলাম।

সরাইয়ে উঠোন জুড়ে ভেড়ার নাদির এক স্তর জমেছে তার মধ্যে বৃষ্টির জল পরে খুবই খারাপ অবস্থা। আমি দাঁড়ানো অবস্থায় লাহুলীদের উলের গোলা পাকানো দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গী এসে এই কাজে যোগ দিল। সরাইটা লম্বা এবং দু-পাশে খানিকটা করে ঘোরানো অনেকটা ইংরেজি ‘E’ অক্ষরটির মতো যার মাঝখানের চিহ্নটি নেই। দুদিকের বাড়ানো অংশে দুটো করে ঘর যাতে তিনটে করে দরজা ছিল আর মাঝখানের অংশে ছিল পাঁচটি দরজা। সরাইয়ের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাতেও তারা উলের সুতো টেনে টেনে ভরিয়ে রেখেছিল। বেরোবার জন্য শুধু একটা দরজা উঠোনের দিকে ছিল, তার বাইরেও আবার বসে ছিল দুটো কুকুর, একটা কালো, আরেকটা সাদা রঙের। উলের গোলা বানিয়ে একজন গুঁণতে শুরু করল। আমি ভাবলাম ওরা এক বিশ, দুই বিশ, এভাবে গুণবে, দেখলাম ওরা যর্গা-থম্প(একশত) গুণতে পারে। দুশোর বেশি উলের গোলা ছিল। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তারা চাঙ-থাঙ (তিব্বত) থেকে উল নিয়ে এসেছে। বছর খানেক আগে থাকতেই চাঙ-থাঙের মেঘ পালকদের কাছে এরা দান দিয়ে আসে। মালিক ভেড়া গুণতি করে তার চরবার খরচ, চা, চিনি ইত্যাদির দাম নগদ পয়সায় বুঝে নেয়। পশম ছাঁটা, তার ঝাড়াই বাছাই খরিদারের দায়িত্ব। এবার এই উল যাবে কুলুতে। সেখান থেকে ধারিওয়াল, কানপুর অঞ্চলের পশমি কাপড় তৈরির কারখানাগুলো এই উল কিনে নেবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরেক দল মেঘ পালক তাদের ভেড়ার পাল সহ সেখানে এল। গুণতি করে ভেড়া ঘরে ঢোকাবার সময় দেখা গেলো একটা কম। দুজন লোক সেই ভেড়া খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। তারা মুখে সিটি বাজিয়ে শিস দিয়ে হারানো ভেড়াটাকে ডাকছিল। যত তারা ওপরের দিকে উঠছে সিটির আওয়াজ তত দুরাগত বলে মনে হচ্ছিল। সরাইয়ের ঠিক নিচ থেকে নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে সর্বদা একটা ঘড়-ঘড় আওয়াজ হতেই থাকে। নদীর এই আওয়াজের জন্য খচ্চরের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাইনি। লাহুলীরা বলল তোমার দলবল ওপারের সরাইতে গেছে। তাদের একজন এগিয়ে এসে কুকুর দুটোকে সামলাল, আর সেই অবসরে আমিও ঘোড়ার পিঠে, প্রাচীরের বাইরে চলে এলাম। মিনিট কয়েকের মধ্যেই পুল পার হয়ে নদীর অন্য তীরের ডাকবাংলোর লাগায়ো সরাইতে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম সঙ্গীরা খচ্চরের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে তার পিঠে ঢাকা দিচ্ছে। রাত্রি নটা বেজে গিয়েছিল। দুজন লোক খচ্চরদের চরাবার জন্য নদীর ধারে নিয়ে গেলো। বাকিরা অন্য কাজকর্মে লেগে গেলো। টর্চ জ্বলে দেখলাম, এই সরাইটিও আগেরটির আদলেই তৈরি। লম্বায় পাঁচটি ঘর আর দু-পাশে দুটি করে। একটা ঘর পরিষ্কার করে সঙ্গীরা আমাকে সেখানে থাকতে বলল। আমি বললাম, হারপোকাকে অথবা খাওয়ানোর মতো অতিরিক্ত রক্ত আমার নেই। তাও যদি চূপচাপ নিত, সহ্য কার যেত। কিন্তু এরা রক্তও নেবে এবং যন্ত্রণায় ঘুমোতেও পারব না, তার চেয়ে আমার তাঁবুর আশ্রয়ই অনেক ভালো। অতঃপর আমার বিছানা বাইরে তাঁবুর ভেতরেই পড়ল। তাঁবু খাটানো হয়ে গিয়েছিল, মোমবাতির আলোতে আজকের দিনলিপি লিখে শুয়ে পড়লাম।

সকালের সমস্ত কাজকর্ম সেরে যাত্রার উদ্যোগ করতে গিয়ে দেখি, আমার সঙ্গীদের তৈরি হতে তখনও অনেক দেরি আছে। অগত্যা দুপুরের আহাৰ্য হিসাবে কিছু আপেল আর বিস্কুট

ঝোলায় ভরলাম। ডিম তো ফোলঙ-ডন্ডার কাছেই শেষ হয়ে গেছে। প্রস্তুতি সেরে একা রওনা হলাম। অল্প অল্প বৃষ্টি তখনও হচ্ছিল। গোবরাতি (বর্ষাতির এই নামই আমার সঙ্গীরা দিয়েছে) দিয়ে মাথা আর পিঠ ঢেকে নিয়েছিলাম। কিন্তু শরীরের সামনের অংশ বৃষ্টিতে ভিজছিল। গতরাত্রিতে যে পুল পার হয়ে সরাইতে এসেছিলাম, সেটিকেই আবার পার হয়ে ভাগা নদীর ডান দিকে এলাম। এরপর কিছু কঠিন উতরাইয়ের মুখোমুখি হতে হবে, অতএব ঘোড়াকে ছোটানো চলবে না। যতই নামছি ততই চারদিকে সবুজের সমারোহ বাড়ছে। ভাগার বাঁ-কিনারায় ভূর্জ গাছ দেখবাব জন্য আরও দেড় মাইল উতরাই ভাঙলাম। ডান তীরে অনেক দেবদারু গাছও চোখে পড়ল। রাস্তা বেশ ভালো, মাঝে মধ্যে যে মেরামতির কাজ হয়েছে, তা দেখে বোঝা যাচ্ছে, তবুও উতরাই এত বেশি খাড়া যে পথের নিচে তাকাতে পর্যন্ত ভয় হচ্ছিল। নামতে নামতে এক তৃণভূমির অরণ্যে এসে পড়লাম। ডানদিকে, মানুষের পক্ষে সাধারণভাবে দুরারোহ, এমন একটা বড় পাথরের ওপর একটা পুরানো মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। দু-পাশে চাষের খেত উজাড় পড়ে আছে। কত কাল সেখানে কোনো চাষ-আবাদ হয়নি।

পুরো সাতদিন পরে আমরা দুপুর বারোটার সময় প্রথম একটা বাড়ি দেখলাম। এখানে পাহাড়ের চারদিকে প্রচুর গাছ রয়েছে, বিশেষ করে দেবদারু গাছ। এখানকার বাড়ি ঘরে লাদাখী ছাপ নেই। গ্রামের নাম হিলদার-চা। কিছু স্ত্রীলোককে ফিরোজার সর্পাকৃতি লাদাখী শিরোভূষণ পরে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। একজন স্ত্রীলোককে দেখলাম পিঠে বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে, তার নাকে একটা দু-আনা সাইজের সোনার 'লোগ' (নাকে পরার গহনা)। বুঝলাম বাড়ি-ঘরের ক্ষেত্রে লাদাখী আদল না থাকলেও গয়নার বেলায় লাহুলের মেয়েরা লাদাখের 'স্পিরোক' আর 'লোগ'-কে বেশ খুশি মনেই মেনে নিয়েছে। তবে আরও কিছুটা আগে গিয়ে দেখেছি যে লাদাখী স্পিরোকের চলন এই দার-চা গ্রামেই শেষ হয়েছে।

প্রথমেই গ্রামে ঢুকে যে বাড়িটাকে দেখেছিলাম তার কাছ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, খানিক দূরে একটা ত্রিধারা সঙ্গম। আমরা মাঝখানের ধারার তটরেখা ধরে চলছিলাম। দেখলাম বাঁ-দিক থেকেও একটা স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। ডানদিকের ধারাটি পার হয়ে আরও আধমাইল পথ অতিরিক্ত চলে সেতুর কাছে পৌঁছলাম। সেতু অতিক্রম করে ভাগা নদীর সম্মিলিত ধারাটিকে উদ্দেশ্য করে এগোলাম। এদিকের পথে কিছুটা চড়াই পেলাম। চারদিকে অনেক ছোট বড় পাথরের খণ্ড পড়েছিল যার মধ্যে দু-এক জায়গায় কয়েকটা দেবদারু গাছও খাড়া হয়ে রয়েছে। আমার মনে হলো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে এখানে সঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু সেদিন রাত্রিবেলা সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এই বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকা পাথরের কাহিনি শুনলাম। অনেককাল আগে এখানে একটি বড় ধরনের গ্রাম ছিল। গ্রামে একশো ঘর লোক বাস করত। একদিন গ্রামে ভোজের উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, যাতে সমস্ত গ্রামবাসীরাই অংশগ্রহণ করেছিল। ভোজ আরম্ভ হতে যাচ্ছে এমন সময় বড় লাচার দিক থেকে এক বৃদ্ধ সেখানে এল। গ্রামের লোক বৃদ্ধকে সাধারণ কোনো ভোটিয়া ভেবে দূর দূর করে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। গ্রামের সীমানার বাইরে কিছু রবাক্তরা বসেছিল। কেউ কেউ বৃদ্ধকে সেখানে যেতে বলল। ভোজসভার একেবারে শেষ পংক্তির এক কোণে একটি ছেলে বসেছিল। সে বৃদ্ধকে ধরে নিজের আসনে বসাল। ভোজনের শেষে ছঙ-পান চলছিল। হঠাৎ সেই বৃদ্ধের

খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেলো, সে কোথাও নেই। কেউ বলতে পারল না যে বৃদ্ধ কখন ভোজসভা ছেড়ে চলে গেছে। যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে ঘটনাটা ভুলে গেলো। হুঙ পানের পর নাচগান, হৈ-হুল্লোড় চলল। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঝড় এল আর সেই সঙ্গে চলল অবিরাম প্রস্তর বর্ষণ। দেখতে দেখতে সমস্ত গ্রাম ওই পাথরের স্তূপে চাপা পড়ে গেলো। একমাত্র যে ছেলেটি বৃদ্ধকে নিজের আসনে বসিয়েছিল প্রবল ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক নিরাপদ জায়গায় রেখে এসেছিল। সেই ছেলেটির বংশধরেরা আজও নদীর ওপারে বাস করছে। আমার মনে হলো যে ওই বংশের বংশধরেরাই বোধ হয় বংশ পরম্পরায় গ্রামের লোককে এই পরম 'ঐতিহাসিক' কাহিনিটি শুনিয়ে আসছে। কাহিনির এখানেই অন্ত নয়, আরও কিছু আছে। যে পাথরের স্তূপের নীচে সমস্ত গ্রাম চাপা পড়েছিল, সেখানে পরে একটি প্রেত এসে বাসা বাধে। দিনদুপুরেও সে জ্যাস্ত মানুষ ধরে খেয়ে ফেলত। শুদিক দিয়ে চলতে বাধ্য হওয়া পথিকের দল 'ব্রাহিমাম্' উচ্চারণ করতে করতে পথ চলত। আশপাশের গ্রামের লোক অনেক পূজা, অর্চনা, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি করেও সেই মনুষ্যভূক প্রেতকে বাগে আনতে পারেনি। মাত্র বছর দুই-তিন আগে হামিস্ (লাদাখ) মঠের মোহান্ত স্তগ্-সঙ্-বস্-পা কোনো কাজে এদিকে এসেছিলেন এবং এক জোরাল মন্ত্রের জোরে ভূতকে বেঁধে ফেলেন। সেই থেকে সেই ভূত বাঁধা অবস্থাতেই আছে। কোনো উৎপাত করে না। কোনো লোক তাকে আর বেরোতেও দেখেনি। প্রথমে পাথরের স্তূপে চাপা পড়া গ্রামবাসীদের জন্য আমার দুঃখ বোধ হলো, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে প্রেতপর্বের কাহিনি শুনে আমার আত্মা, শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে বন্ধু কুশোক স্তগ্-সঙ্-বস্-পা'কে আশীর্বাদ করতে লাগল। কারণ যদি কুশোক সেই প্রেতটাকে বাঁধতে না পারত, প্রেত মুক্ত অবস্থায় থাকত। তাহলে আজই আমি ওখান দিয়ে একা একা এসেছি আমার অবস্থা কি হতো? আমার লেখা চিঠি তাহলে কোনোভাবেই তোমার কাছে পৌঁছাত না। সবচেয়ে বেশি আফশোশ হতো, মুক্খুলালের ঘোড়ার জন্য যার পিঠে আমি সওয়ার ছিলাম। যদি প্রেতের সওয়ারিকে খেয়ে পেট না ভরত, তাহলে সে নিশ্চয়ই ঘোড়াটাকেও খেত। বেচারি ঘোড়া আমার জন্য তার প্রাণটা বেঘোরে হারাত। এই 'সত্যি' এবং 'ঐতিহাসিক' কাহিনিটি আমি পরে ঠাকুর কল্-সঙ্-দাবার (খুসহালচন্দ) কাছে আরও বিস্তৃত আকারে শুনেছিলাম। এখানে বলে রাখি ঠাকুর সাহেবের বয়স পনেরো এবং তিনি কুলু হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

এখন বৃষ্টিটা আপাতত বন্ধ, তবে আকাশে এখনও ঘন মেঘ, যে কোনো সময়েই আবার বৃষ্টি নামতে পারে। বৃষ্টি বন্ধ থাকায় লোকে খেতের ফসল, কিংবা ঘাস কাটছে। দেবদারু ছাড়া অন্য সব গাছই হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে, অর্থাৎ শীত আসছে। শীতের সময় মাঠ-ঘাট বরফে ঢাকা থাকার জন্য পশুখাদ্যের যেমন ঘাস, গাছের পাতা ইত্যাদির জন্য প্রচণ্ড কষ্ট পেতে হয়। সে জন্য এখন থেকে ঘাস কেটে বাড়িল বেঁধে শীতের জন্য জমিয়ে রাখবে। রাস্তার দু-ধারে অনেক পাহাড়, যাকে পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভালো। পথে কয়েক জনের সঙ্গে আমি ভোট (তিব্বতী) ভাষায় কথাবার্তা বলে দেখলাম এখানকার লোক তা বোঝে। আশপাশে প্রচুর গাছ থাকায় বাড়ি ঘর তৈরিতে কাঠ ব্যবহারে কোনো কার্পণ্য করা হয়নি। এমনিতেই লাল্ল অঞ্চলে লাদাখের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তবুও এবছরের বর্ষা সম্বন্ধে লোকে বলাবলি করছিল যে এমন বর্ষা নাকি

গ্রামের বয়ঃবৃদ্ধরাও তাদের জীবনে কখনও দেখেনি, এমনকী শোনেওনি। বর্ষা এবং তজ্জনিত ধ্বসের ফলে পথে বেশ কয়েকটা বাড়ি বাঁকা টেড়া কিংবা ধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে দেখলাম। চলতে চলতে অবশেষে বেলা দুটোর সময় আমরা কে-লঙ গ্রামের টোলেগ্য-মুর এলাকায় পৌঁছলাম। খোঁজ করে সহজেই মঙ্গলচন্দের (যার তিব্বতী নাম ট-শী-দা-বা) বাড়ি পেয়ে গেলাম। গ্রামের মধ্যে রাস্তায় গোবর, ভেড়ার নাদি এবং বর্ষায় অবরুদ্ধ জল মিলে মিশে এমন জ্বরদস্ত কাদা তৈরি হয়েছে যে, যে কোনো সময়েই পিছলে পড়ে যাবার ভয় ছিল। ঘোড়াটাকে বাড়ির বেড়ার বাইরে একটা খুঁটিতে বেঁধে দিলাম। একটি ছোট মেয়ে এসে আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলো। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতেই অন্ধকারে সব যেন কেমন গুলিয়ে উঠল। আমাকে রান্না ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে প্রচুর ধোঁয়ার মধ্যেও কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছিল দেখলাম। সেই আলোয় দেখলাম মাথার চুলে অনেকগুলো ছোট ছোট বিনুনি করে পিঠে ঝোলানো, মাথায় বেশ বড় আকারের একখানা রূপোর শিরোভূষণ, যার মধ্যে একটি ঘুঁড়ুর বসানো, কানে বড় বড় হলুদ গয়না পরা এক স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত এবং ঘরের অন্য সকলকে সে চা, ছুঁ আর সতু দিচ্ছে। যারা বসে খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত ছিল তারা সকলেই বাড়ির কাজের লোকজন বলে মনে হলো। গৃহস্বামিনী নিজেই অতিথি সেবা করছিলেন, তাঁর পায়ে রাবার সোলের জাপানি জুতো। পোশাক ও আভূষণ দেখেই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে উনিই গৃহকর্ত্রী। হলুদ পোশাক-পরা অচেনা আমাকে দেখে গৃহকর্ত্রী এবং তাঁর অতিথিরা সকলেই চমকে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ‘কে’, ‘কোথেকে’, ‘কেন’ ইত্যাদি প্রশ্নবান আমার দিকে ছুটে এল। আমি যা বললাম সেটা অত্যন্ত উপেক্ষাভরে শোনা হলো। ঘরের মধ্যে আমি তখনও ঠায় দাঁড়ানো। আমাকে কেউ বসতে বলল না। এমনকী আমাকে নিয়ে তাদের মধ্যে হাসিঠাট্টাও শুরু হয়ে গেলো। ঠাকুর মঙ্গলচন্দ্র ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারকে পৌঁছাতে কে-লঙ গেছেন। সমস্ত অবস্থা দেখে মনে হলো চলেই যাই, অন্য কোথাও আশ্রয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, না হলে ডাকবাংলো তো আছেই। আসার পথে সেটিকে দেখেও এসেছি। আমার কাছে কুলুর প্রান্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মি: লি. শাটলওয়ার্থ, আই. সি. এস. এবং বর্তমান অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, দুজনারই চিঠি ছিল। আমি চিঠি দেখলাম এবং বললাম, আমার বন্ধু মি: শাটলওয়ার্থ ঠাকুর মঙ্গলচন্দের নামে চিঠি দিয়েছেন। একটি বছর পনেরোর ছেলে আঙনের কাছ থেকে উঠে আমার কাছে এল, এবং চিঠি দুটো হাতে নিয়ে দেখে মাকে গিয়ে কিছু বলল। ব্যাস্ মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অবস্থা আমূল পালটে গেলো। তিনতলার বৈঠকখানা ঘরে চাকর বাকরেরা কিছু বাঁড়পোঁছের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমাকে বারান্দার একটি চারপাইতে বসতে অনুরোধ করে সকলে মিলে ঘর পরিষ্কারের কাজে লেগে পড়ল। আমি সেই অবসরে যার হাতে চিঠি দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। ছেলেটির নাম ঠাকুর খুসহালচন্দ্র, ঠাকুর মঙ্গলচন্দের ছেলে, তিব্বতী নাম কল্-সঙ্-দাবা। এখানে ঠাকুর বংশীয়দের মধ্যে হিন্দি এবং তিব্বতী দুটো নামই চলে। ইতিমধ্যে ঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমি ভিতরে গিয়ে বসলাম। চায়ের কথা জিজ্ঞেস করায় আমি বিনা দুধের, নুন, মাখন দেওয়া চায়ের কথা বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা এসে গেলো। গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে একটি লাল মখমলের কুর্তা পাজামা ও জ্যাকেট পরা এক ঘোড়াশীকে কাজ করতে দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম মেয়েটি হয়তো ঠাকুর সাহেবের মেয়ে, কিন্তু সে ছিল ঠাকুর মঙ্গলচন্দের পুত্রবধু এবং শ্রীমান খুসহালচন্দের স্ত্রী। লাহলে ঠাকুরদের মাত্র তিনটি



ঘরানা আছে। এরা নিজেদের ঘরের মেয়েকে অ-ঠাকুরদের সঙ্গে বিয়ে দেয় না। যার জন্য এদের মধ্যে বেজোড় বিয়ের প্রথা চলে। এই মেয়েটি গুঁদেলের ঠাকুর ফতেচন্দের বোন।

দেখতে দেখতে রাত্রি অনেক হলো, কিন্তু ঠাকুর সাহেব তখনও ফেরেননি। মিঃ শাটলওয়াথ এবং লাদাখের বন্ধুরা আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে লাহুল অঞ্চলের প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্যাবলী ঠাকুর মঙ্গলচন্দ্রর কাছে পাবে। কিছুক্ষণ পর শুনলাম ঠাকুর সাহেবের এক ভৃত্য কে-লঙ থেকে ফিরে এসেছে এবং ঠাকুর সাহেবও যে কোনো মুহূর্তেই ফিরে আসবেন। শুনে স্বস্তির নিশ্বাস নিলাম।

বিছানায় শুয়ে পড়েছি, এমন সময় ঠাকুর সাহেব এলেন এবং অত্যন্ত উষ্মতা ও হৃদয়তার সঙ্গে আমাকে স্বাগত জানালেন। রাত্রি অনেক হয়েছিল তাই সৌজন্যমূলক কথাবার্তা ছাড়া আর কোনো কথা হলো না।

২৮ সেপ্টেম্বর সকালে উঠলাম। ঠাকুর সাহেবের বধূ জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এখানকার মেয়েরা সব ব্যাপারেই স্বাধীন। ঠাকুর মঙ্গলচন্দ্রের মতো কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়িঘর যদি মধ্য ভারতে হতো তাহলে বাড়ির মেয়েরা এরকম স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারত না। কঠিন অবরোধে থাকতে হতো। প্রাত্রাশের পর ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে আলাপচারিতা শুরু হলো। ডঃ ফ্রাঙ্ক তাঁর *Antiquity of Indian Tibet, part II* গ্রন্থে ঠাকুর সাহেবের বংশের সঙ্গে কোনো রাজপুত বংশের যোগকে শ্রেফ কল্পিত বলে নস্যং করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে এই বংশ তিব্বত থেকেই লাহুল অঞ্চলে এসে বসবাস করছে। অন্য দিকে ঠাকুর মঙ্গলচন্দ্রের বাবা ঠাকুর হরিচন্দ্র তাঁদের বংশের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিব্বতের কোনো বংশের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগকে অস্বীকার করেছেন। যদিও এদের মাতৃভাষা তিব্বতী। আমি মধ্যপথ নিয়েছিলাম—মায়ের বংশের দিক থেকে তিব্বতী আর পিতৃবংশের দিক থেকে কাঙড়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশের রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেছিলাম। আমি আমার ধারণার কথা বলতেই ঠাকুর মঙ্গলচন্দ্র বললেন—আপনিই সঠিক। আমাদের পূর্বজ নীলা রাণা বাংলা মুলুক থেকে এখানে এসেছিলেন। তখন ঘঙ-সর (ক-লঙ) এবং তার চারপাশের অঞ্চলে এক রাজকন্যার শাসন ছিল। নীলা রাণা সেই রাজকন্যাকে বিয়ে করেন, তাদের সন্তানাদি হয়। নীলা রাণা পরে প্রজাদের কাছে অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা হিসাবে পরিচিত হন। রাজার ছিল অত্যাধিক শিকারের সখ। একদিন তিনি মৃগয়ায় গিয়েছেন। সেখানে অরণ্যের মধ্যে তাঁর শিকার একটা গর্তে পড়ে যায়। সঙ্গের লোকজনকে সেই গর্তে নেমে শিকার ধরে নিয়ে আসতে আদেশ করলে, সকলেই সেই আদেশ মানতে অস্বীকার করে। অগত্যা রাণা কোমরে দড়ি বেঁধে শিকার আনার জন্য নিজেই সেই গর্তে নামলেন। গর্তটি বেশ গভীর ছিল। নীলা রাণা গর্তে নামার পর তাঁর সঙ্গীরা ওপর থেকে দড়ি কেটে দিল। বোচারা রাণা গর্তের মধ্য থেকে প্রচুর চিংকার চেচামেচি করলেন, কিন্তু গহন অরণ্যে তা শোনার এবং তাতে সাড়া দেবার কেউ ছিল না। গর্তের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় নীলা রাণার মৃত্যু হয়। এই কাহিনি নিয়ে এতদঞ্চলে অনেক লোকগান প্রচলিত আছে। আমি ঠাকুর পৃথ্বীচন্দ্রকে অনুরোধ করেছি সেগুলোকে সংগ্রহ করে রাখতে। মায়ের দিক থেকে এই বংশের সম্পর্ক মহান স্ত্রোন-চন্-গম-পো'র বংশের সঙ্গে এবং অতিশাকে (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) যারা তিব্বতে আত্মন করেছিলেন সেই লহু-লামা যে-সোস্-ওদ্-এর বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে গেলাম গ্রাম থেকে আধ মাইল দূরে খানিকটা চড়াইয়ের ওপর অবস্থিত গর্ভ-মোত মঠ দেখতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সব মঠ নির্মিত হয়েছিল। ভোট দেশীয় লামা ধিন্-লে-শিঙ-তা-এর স্থাপয়িতা ছিলেন। মি: শাটলওয়ার্থ এই মঠের রেশমি চিত্রপটগুলোর খুব প্রশংসা করেছিলেন। আমি সেগুলোর ছবি তুললাম। মন্দিরের গর্ভগৃহের দেয়ালেও কিছু চিত্র ছিল। দেখে মনে হলো মন্দিরের এই অংশটা ঠিন্-লে-শিঙ-তা'র আমলের চেয়েও প্রাচীন। ঠাকুর সাহেব যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে আমাকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতা এবং সঙ্গীদের তাড়ার ফলে আমাদেরও তাড়াতাড়ি করতে হলো। সঙ্গীদের আগে রওনা করিয়ে দিয়ে বেলা দুটো নাগাদ আমিও বের হলাম। কে-লঙ (লাহুলের সদর) এখান থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তা ভাগা নদীর কিনারা ধরে উতরাই পথে। যত নিচে নামা যায় ততই বসতি, চাষের খেত এবং সবুজ গাছপালার সংখ্যা বাড়তে থাকে। লাহুলকে তিব্বতী এবং লাহুলী উভয়েই বলে গর-জা অথবা হ-শা, 'লাহুল' বলে কুলু এবং সমতলের লোকে। অন্য গ্রামের মতো এখানেও দেবদারু বাদে অন্য গাছে হলুদ রং লেগেছে। এই প্রদেশ দেখে আমার অনুভূতি—শীতল, সবুজ এবং যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। এর অন্য এক নাম ল্হ-য়ুল (যা থেকে লাহুল নাম হয়েছে)। ল্হ-য়ুলের অর্থ দেবতাদের দেশ—একেবারে সঠিক নামকরণ।

লাহুলের জনসংখ্যা দশ-হাজারের মতো। বহুপতি বিবাহ প্রথা এক সময় এখানকার রেওয়াজ থাকলেও আজ তা লুপ্ত হবার পথে। এর ফলে জনসংখ্যা বাড়ছে। বিগত জনগণনায় এখানকার এবং স্পীতির লোকেরা নিজেদের হিন্দু বলে লিখিয়েছিল। ঠাকুর সাহেব সেজন্য খুব আপশোষ করছিলেন। আমি বললাম—আমরা কিছুতেই 'হিন্দু' শব্দটাকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। এই শব্দটা আমাদের সম্মিলিত পরিচয় বহন করে। এখানকার লোক অনায়াসেই নিজেদের পরিচয় হিন্দু-বৌদ্ধ হিসাবে লেখাতে পারে। ঠাকুর সাহেব বললেন—তাই তো লেখায়।

চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে বেলা পাঁচটার সময় কে-লঙ পৌঁছলাম। কে-লঙে লাহুলের তহসিলদার থাকে। এই পদ ঠাকুর মঙ্গলচন্দ্রের বংশধরদের জন্য বাঁধা। ঠাকুর মঙ্গলচন্দ্রের পিতা ঠাকুর হরিচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে ঠাকুর অমরচন্দ্র তহসিলদার হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে ঠাকুর অভয়চন্দ্র ওই পদে আসীন হন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটায় তাঁর ছোট ভাই ঠাকুর প্রতাপচন্দ্র লাহুলের তহসিলদার হন এবং এখনও পর্যন্ত তিনিই ওই পদে বহাল রয়েছেন। এদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই পৃথ্বীচন্দ্র। এফ.এস. সি. পরীক্ষায় পাস না করতে পেরে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বসে ছিলেন। এ বছরের গোড়ার দিকে বর্মায় চলে গিয়েছিলেন। বর্মা থেকে ফিরে এলেও সেখানকার প্রভাব ওঁর মধ্যে ভালোই পড়েছে, আজকাল সেজন্য পালি পড়া আরম্ভ করেছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তিব্বতী ভাষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফ.এ. পরীক্ষা দিয়ে আরও অগ্রসর হন। পৃথ্বীচন্দ্রের আবার সামরিক বিভাগে কমিশনড অফিসার হবারও ইচ্ছা আছে। সেজন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং এবছরের শেষেই পরীক্ষায় বসার কথা। যদি সেই পরীক্ষায় পাস করেন তো সৈন্য বাহিনীতে আর না হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী ভাষা নিয়ে পড়া, যে কোনো একটা হবেই। কে-লঙে তাঁর বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তহসিলদার সাহেব বাড়ি ছিলেন না, গিয়েছেন ডেপুটি কমিশনারকে পৌঁছাতে। পৃথ্বীচন্দ্রই তাঁদের বাড়িতে আমাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন।

কে-লঙে একটা সরকারি হাসপাতাল এবং একটা মিডল ইংলিশ স্কুল আছে। একটা ক্রিস্চান মিশনারি সংগঠনও আছে যারা পৌনে এক শতাব্দীর চেষ্টায় মাত্র তিন-চারটি পরিবারকেই তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছে। এখানে বেশ কয়েকটি দোকানও আছে। আগে এখানে জিরা এবং উল প্রচুর পরিমাণে আমদানি হতো। ভারতের অন্যত্র যে অস্ত্র আইন চালু আছে এই অঞ্চল তার আওতার বাইরে। এখানে কোনো বিধিনিষেধ নেই।

প্রিয় আনন্দজি

২৯ সেপ্টেম্বর ঠাকুর পৃথ্বীচন্দের সঙ্গে গুঙ-রঙ দেখতে গেলাম। লাখ্লে খঙ-সরের পরই গুঙ-রঙ আর গুঁদলার ঠাকুরদের প্রতিষ্ঠা। খঙ-সরের মতো গুঁদলাতেও রাণাপাল সর্বপ্রথম এসেছিলেন; কিন্তু গুঙ-রঙের মেয়েই প্রথম তাঁর সন্তানের জননী হন। এখন এই তিন ঠাকুর পরিবারের মধ্যে বিয়ে-শাদি হয়। লাদাখের বর্তমান রাজার 'রানি' গুঙ-রঙের বর্তমান ঠাকুরের পিতৃস্বসা। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি মন্দির আছে। যার মধ্যে স্তোন-পা'র (শাস্তা) মূর্তি আছে। মন্দিরের অবস্থা খুবই খারাপ, দেয়ালের চিত্রপটের খুব সামান্যই অক্ষত আছে। প্রধান মূর্তির পিছনের দেয়াল ভেঙে পড়ে গিয়ে অন্য কয়েকটি মূর্তিকে ভেঙে ফেলেছে। এখন সম্পূর্ণ মন্দিরটিই ধ্বংস হবার অপেক্ষায় কাল গুণছে। গ্রামবাসীরা মনে করে মন্দির মেরামত করলে দেবী রুষ্ট হবেন, তাই তারা সে কথা ভাবে না। আমি ঠাকুর প্রেমচন্দ এবং ঠাকুর পৃথ্বীচন্দকে অনেক করে অনুরোধ করেছি যাতে তাঁরা এবিষয়ে একটু দৃষ্টি দেন।

ওখান থেকে নদী পার হয়ে দুটো প্রাচীন মূর্তি দেখতে যাবার কথা ছিল। পথ প্রদর্শব হিসাবে একটি ছেলেকে আমার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। আমার সেই পথ প্রদর্শকের কথা কী আর বলব। সে তার পছন্দ এবং সুবিধা মতো রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করল, আর তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমার অবস্থা হয়েছিল সঙিন। কখনও কখনও চতুষ্পদের ভূমিকাও নিতে হয়েছে। উতরাই ছিল প্রায় এক মাইলের মতো। রাম রাম করে সেই কঠিন পথ শেষ করলাম। ভাবছিলাম, শান্তরক্ষিত আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কথা। তাঁরাও আমার মতোই সমতলের লোক ছিলেন। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে কিভাবে ভোট দেশের সেই দুর্গম পথে তাঁরা চলেছিলেন। মনে হয় তাঁরা পথের কাঠিন্যের কথা জানতেন না বা জানানো হয়নি। যখন জেনেছেন তখন আর পিছোবার উপায়-ছিল না। তিব্বতে গিয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁদের হঠকারি সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ করেছেন। যাই-হোক, অনেক কষ্টে সেতু পার হয়ে জো-লিঙ (স্বামী-দ্বীপ) পৌঁছালাম। বহুকাল কোনো সংস্কার হয়নি এবং যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে, এমন একটা বাড়িতে একাদশ শতকের সুন্দর দুটো দারু প্রতিমা দেখলাম। বর্ষা আর তুষার মূর্তির অনেকটাই নষ্ট করে ফেলেছে। এলাকার লোকের মধ্যে অদ্ভুত এক ধারণা আছে যে ওইসব ভেঙে পড়া মন্দির অথবা মূর্তির কোনো সংস্কার করতে গেলেই নাকি দেবতারা রুষ্ট হবেন এবং শাস্তি দেবেন। দেবতাদের দেওয়া শাস্তি হলো পাহাড় থেকে পাথর বৃষ্টি, তুষারঝড় বা অন্য কিছু। যাইহোক, সেই আংশিক অক্ষত মূর্তি দুটিকে দেখলাম এবং তার ছবি তুললাম। বেলা প্রায় বারোটা, কে-লঙে আহার তৈরি ছিল কিন্তু সেখানে যাবার সময় ছিল না। স্থানীয় এক গৃহস্থ লামার ঘরে নুন সহযোগে রুটি খেয়ে নিলাম। বেলা একটার সময় কে-লঙ পৌঁছে ঠাকুর পৃথ্বীরাজকে সঙ্গে নিয়ে আবার রওনা হলাম। প্রধান রাস্তার ওপরে ভাগার পুল ভেঙে যাওয়ায় কঠিন উতরাই ভেঙে নিচে নেমে সাঁকো পার হয়ে

আবার চড়াই ভেঙে প্রধান রাস্তায় আসতে হলো। ওপরে এসে দেখি ঘোড়ার চামড়ার বাঁধনের সামনের অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। চড়াই-উতরাইয়ের সময় ছিঁড়লেই হয়েছিল আর কি। একটু এগিয়েই ফোব-দঙ গ্রাম পেলাম। একজন লামা কাছেই একটি সুন্দর মঠ বানিয়ে রেখেছেন। গ্রামে লামার বেশ প্রতাপ আছে দেখলাম। লোকে বলছিল লামা নাকি চারতলা সমান উচ্চতায় তাঁর আসন বাঁধেন এবং সেখানে বসে ধ্যান করেন। ধ্যানের শেষে ওখান থেকে লাফিয়ে নামেন। হঠাৎ যোগের ক্রিয়া নিশ্চই কিছু লোকটা জানে, না হলে এতগুলো লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে কি করে? গ্রামের কাছে একটা পাথরে দুটো অল্লীল মূর্তি খোদাই করা আছে। দু-তিন মাইল চলার পর আবার কঠিন উতরাইয়ের মুখোমুখি হলাম। উতরাই ভেঙে নিচে যেখানে পৌঁছলাম সেখানে ভাগার ওপরে ডাঙা পুলের বিকল্প পুল তৈরি হচ্ছিল। ওখান থেকে আবার চড়াই ভেঙে গুরুঘাটাল যাবার কথা ছিল। কিন্তু চারটে বেজে গিয়েছে, অন্ধকার নামার আগে কিছুতেই নামা সম্ভব হবে না। নামার পরও দু-মাইল যেতে হবে, অথচ শুনলাম মন্দিরটিও খুব প্রাচীন নয়। অতএব সামনে চলাই সাব্যস্ত হলো। কিছু আগেই চন্দ্রা নদী এবং ভাগা নদী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং সেই সম্মিলিত ধারার নাম চন্দ্রভাগা, সমতলে যার নাম চেনাব নদী। চন্দ্রার কিনারায় চারটি এলাকা, ভাগার কিনারায় চারটি আর চন্দ্রভাগার কিনারায় সাতটি এলাকা বা কুঠি আছে। চন্দ্রভাগার তটভূমি এতই উষ্ণ যে এখানে মকইজাতীয় ফসল বছরে দুবার উৎপাদন করা যেতে পারে। এই এলাকার নাম পাটন (নদীর ঘাট), এখানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে। লাহুলের দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে কো-লঙ (খঙ-সর), কে-লঙ, গুঁদলা এবং পাটন এই চার অঞ্চলের ভাষারই প্রচলন আছে। সন্দের সময় গুঁদলা পৌঁছলাম। ওখানে ঠাকুর ফতেচন্দের সঙ্গে পৃথীচন্দের বোনের বিয়ে হয়েছে। এখানে একটি লোয়ার মিডল স্কুল আছে। গুঁদলার ঠাকুর সাহেবের বাড়িটি তিব্বতের দলাইলামার বাসস্থান পোতলা প্রাসাদের অনুকরণে তৈরি। প্রাসাদের সর্বত্র যথেষ্টভাবে কাঠের ব্যবহার হয়েছে। ছ-তলা একটি কাষ্ঠপ্রাসাদ বলা যায়। আমার সঙ্গীরা আরও চার-মাইল আগে ডেরা বেঁধেছিল। আমি ঠাকুর সাহেবের আগ্রহে ওই কাষ্ঠপ্রাসাদেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নিলাম এবং ‘ঘোড়া বেচে শোনা’ কেনার মতো প্রশান্ত নিদ্রা হলো।

৩০ সেপ্টেম্বর সকালে উঠে প্রথম কাজ ছিল ঠাকুর ফতেচন্দের ছ-তলা কাষ্ঠপ্রাসাদের ছবি তোলা। এরপর তাঁদের নিজস্ব প্রতিমা গৃহে গেলাম। সেখানে এক দিকে কিছু বই রাখা ছিল। এক কপি ‘কর্মশতক’ও সেখানে দেখলাম। বইটির নামকরণ দেখেই সেটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল। হাতে নিয়ে দেখলাম আমার অনুমানই ঠিক। শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত ‘দ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং বইটির অনেকগুলো পৃষ্ঠা তালপাতার পুথির মতো সুতোর বেটনি দিয়ে বাঁধা। পুথিটি খণ্ডিত এবং পরে মাঝে মাঝে নতুন করে লিখে সেই অসঙ্গতি দূর করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। মূর্তির মধ্যে বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাণা পালের একটা মূর্তি ছিল, যেখানে তাঁর পরনে মোগল সম্রাটদের মতো পোশাক। সেই ধাঁচের চৌবন্দি এবং পাগড়ি। এই বংশও ফ্রেন্স- চঙ-গম্বোর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে লুকোতে চেয়েছে। কিন্তু মি: ফ্রান্স তাঁর বইয়ের মাধ্যমে এই লুকোতে চাওয়া সম্পর্কের বিবরণ পাঁচ জনের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। মন্দিরে একটি খড়্গ আছে যার নাম শো-বর-রল-ডী (প্রজ্ঞা-খড়্গ)। খড়্গের গায়ে কিছু চিহ্ন আছে যা দেখিয়ে লোকে বলে ওটিও এক সময় খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল পরে দেবীকৃপায় নিজে থেকেই আবার জুড়ে গিয়েছে।

সব কিছু দেখা শেষ করে প্রাতরাশের জন্য বসলাম। ব্রুকের (Buck Wheat) কুটি আর সঙ্গে দইয়ের রায়তা, একটা উত্তম এবং স্বাদিষ্ট আহার হলো।

সাড়ে আটটার সময় ঠাকুর পৃথ্বীচন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। যথারীতি খচ্চরওলাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। খবর পেলাম যে সি-মুতে একটা মূর্তির গায়ে কিছু প্রাচীন অক্ষর উৎকীর্ণ আছে। প্রথম মন্দির একটু ওপরে উঠতেই পাওয়া গেলো। সেখানে গিয়ে শুনলাম, যে মূর্তিটা আমি খুঁজছি সেটা এখান থেকে আরও দু-মাইল দূরের অন্য একটি মন্দিরে আছে এবং সেখানে যাবার পথটিও ভালো নয়। তবুও চললাম। সেই মন্দিরের পূজারী শুনলাম একজন বৈদ্য। বৈদ্য তো ঠিক সেই রকমেরই হয়, যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে— ‘যানি কানি চ মুলানি, যেন কেনাপি পিশয়েত। যস্য কস্যাপি দাতব্য যদ্ধা তদ্ধা ভবিষ্যতি।’ বৈদ্যরাজ সপরিবারে রাস্তার ধারে বসে ঘাস কাটছিলেন। তাঁকে ঠাকুর মঙ্গলচন্দ্রের লেখা চিঠি দিলাম। চিঠি পরে ঘাসের গাঁঠরি পিঠে নিয়ে চললেন। বাইরে থেকে দেখে বাড়ির অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হলো না। প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘর বাদ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এখানে নতুন করে ছাদ লাগানো হয়েছে, ভেতরের অবস্থাও খারাপ নয়। প্রথম মূর্তিটি ললিতাসনাসীন বোধিসত্ত্বের এবং সেটি পিতলের। মূর্তিটির উচ্চতা এক হাতের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি এবং গঠনশৈলী অত্যন্ত সুন্দর। বৈদ্যজী অক্ষরাক্ষিত মূর্তিটিও দেখালেন। সেটি আট আঙুলের মতো লম্বা। মূর্তিটি পাথরের মুকুটধারী ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ মুদ্রা সহকারে দণ্ডায়মান বুদ্ধের যা বজ্রযানের প্রভাবকে ব্যক্ত করে। মূর্তির পিঠে অক্ষর খোদিত আছে। ফোটো নিলাম, কাগজে ছাপও তুললাম। অক্ষর সম্বলিত মূর্তিটি আনুমানিক দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের হবে। তবে ওটির মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না। বড় পিতলের মূর্তিটি সম্বন্ধে এই অঞ্চলে এক কাহিনি প্রচলিত আছে যে মূর্তিটি স্বয়ং কাশী থেকে উড়ে এখানে এসে বসেছে। মূর্তির গায়ে খোদিত লেখাটি একটি মন্তব্য। যার মধ্যে ‘ইঁ ফট্ স্বাহা’ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এরপর বৈদ্যরাজ আমাকে চা পান করার আমন্ত্রণ জানালেন। সময়ের অভাবে তাঁর আমন্ত্রণকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। বৈদ্যজী কয়েক পা হেঁটেই সরে পড়ার তালে ছিলেন। বললাম, অন্তত রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিন। তারপর পাহাড়ের উতরাইয়ের পথে তিনি তো প্রায় গিয়েছিলেন আর কি। পাহাড়েও এ ধরনের লোক আছে যারা আশপাশে কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে নাক বরাবর চলতে থাকে। বৈদ্যজী অনেক কষ্টে মাইল খানেক এলেন। তারপর দূর থেকে রাস্তা দেখিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমি ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে ধরে সামনে এগোলাম। রাস্তায় এসে পড়েছি, এখন চন্দ্রা নদীর ডান দিক ধরে চলব। রাস্তা বেশ ভালো, কোথাও কোথাও ঘোড়া ছোটাবার মতো অবস্থাও ছিল। সূর্যাস্ত হবার আগেই, খোক্-সর পৌছে গেলাম। চন্দ্রার তীরে এইটিই শেষ গ্রাম। র-টঙ-জোতের তিন মাইল নিচে এর অবস্থান। আমার সঙ্গীরা আগেই সেখানে পৌছে গিয়েছিল।

আজ প্রচুর ওপর-নিচ করেছি, শরীর স্বাভাবিকভাবেই খুব ক্লান্ত ছিল, তাই শোয়া মাত্রই ঘুম এসে গেলো। আমাদের পাশে আরও ছ-সাতটা কারাভান বা কাফেলা ডেরা বেঁধেছিল। আমাদের দলের সর্দার মুক্খুর এক বন্ধু এই গ্রামে থাকে। দুই বন্ধুর দেখা হওয়ায় ভালোই খাতিরদারি হলো। প্রাণভরে সকলকে মদ খাওয়ানোর পর আরও দুবোতল মদ মুক্খুকে উপহার দিল। রাত্রি দশটা নাগাদ সকলে হেলতে দুলতে ডেরায় ফিরল। তাদের হল্পাবাজিতে আমার ঘুম ভেঙে

গেলো। দেখলাম মুক্খু বেশ খোস মেজাজে আছে। মুক্খুর সঙ্গীরা যত তাকে মদ খাওয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে বোঝায় তত তার মত্ততা বাড়ে। পাঞ্জাবের গালাগাল সংগ্রহ করার সখ যদি কারও থেকে থাকে তবে এটাই ছিল তার সুবর্ণ সুযোগ। মুক্খু বাছাই করা শব্দ প্রয়োগ করে গালাগাল দিচ্ছিল। কাকে? সকলকে। মানুষ, পশু, জল, বাতাস, পাহাড় সকলকেই গালাগাল দিচ্ছিল। সঙ্গীদের একজনকে গাল দিতেই সেও পালটা গাল দিল। আমি তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছিলাম, ইতিমধ্যে দেখি ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠেছে আর সাধারণ হাসি ঠাট্টার পর্যায়ে নেই। যাইহোক, তারাই আবার অবস্থার সামাল দিল। মাতালদের মদের অপকারিতা বোঝাতে গেলে অনেক সময় উলটো ফল হয়। তাই আমি বললাম— তোমরা ওকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ কর, বরং ওকে গান গাইতে কিংবা কোনো কিসসা-কাহিনি শোনাতে বল। আমি আবার শুতে চলে গেলাম। ভোর বেলা উঠে দেখি মুক্খু তখনও মরা কাঠের মতো শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

## কুলু

থোক্‌সর থেকে কুলুর দূরত্ব তিনশত মাইল। আক্টোবরের এক তারিখে যাত্রার প্রস্তুতি করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হলো যদি আজই মানালি থেকে কুলু মোটরে চলে যাই। শুধু শুধু খচ্চরগুলাদের সঙ্গে তিন দিন সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। আবার সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতেও পারিনি। সঙ্গীদের মধ্যে সেই ‘গয়ংগছ’ ভাব দেখে, ঘোড়ায় চড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে একটা সাধারণ, পরে একটা কঠিন চড়াই ভাঙতে হলো। তবে ভাগ্য ভালো ছিল কারণ কঠিন চড়াইটি খুব বিস্তৃতভাবে থাকার জন্য তেমন একটা কিছু খাড়াই ছিল না। মাইল ছয় চলার পর সমতল পথ পাওয়া গেলো। খানিকটা চলার পর ব্যাসকুণ্ড এল। সকলে বলল— ব্যাস ঋষির স্থান ব্যাসকুণ্ড এসে গেছে, ওখান থেকেই ব্যাস নদী বেরিয়েছে। আমি বললাম ভাই এর পুরোটাই তো জালিয়াতি। ব্যাস নদীর প্রকৃত নাম বিয়াস - বিপাসা - বিপাট, এর সঙ্গে ব্যাসঋষির সম্পর্ক কি? একটা ছোট স্রোতধারা ওপরের গ্রেসিয়ার থেকে নিচে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। নিচের দিকে নামার পথে কয়েকটা পিচ্ছিল পাথর একটা কুণ্ড মতো সৃষ্টি করেছে আর তার নাম হলো ব্যাসকুণ্ড। বিপাসা পেয়েছিল, জলপান করলাম। এক সজ্জন ব্রাহ্মণ দেবতা, জামা কাপড় খুলে স্নানের উদ্যোগ করছিলেন, আমার সঙ্গী খচ্চরগুলারাও তাঁকে দেখেছিল, তারা গলার আওয়াজ করে বেচারাকে আচমেনেই আটকে দিল। এর পরের রাস্তা উতরাইয়ের, তাই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছিলাম। পথের এক জায়গায় বরফের বড় একটা জমাট স্তূপ পড়েছিল। ওটার ওপর দিয়েই চলতে হবে। সঙ্গীরা তার ওপরে বেশ করে মাটি, পাথর ফেলে পিচ্ছিল ভাবটা কমাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তা সত্ত্বেও চলতে ভয় লাগছিল। আমি বাধ্য হয়ে ঘোড়াকেই বিশ্বাস করে লাগাম আলগা করে তার পিছনে পিছনে চললাম। এক জায়গায় সে রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে যাবার চেষ্টা করতেই লাগাম টেনে ধরলাম কিন্তু সে আমার চেয়ে চালাক ছিল, হঠাৎ দৌড় লাগাল। বাধ্য হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবছিলাম ও যদি শয়তানি করে তাহলে এখানেই আমাকে ঠায় বসে থাকতে হবে। অবশেষে সঙ্গীদের একজন পিছিয়ে এসে সাহায্য করল, ঘোড়াটাকে ধরা হলো। আমিও আবার চলতে শুরু করলাম। অনেকদূর পর্যন্ত নামার পর একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। সে বলল— সাপেদের আস্তানা দেখবে না! আমি জিজ্ঞাসা করলাম— কি ব্যাপার? এখানেও কি

কোনো নাগদেবতার থান আছে নাকি? শুনলাম কোনো এক সময়ে এখানে হাজার হাজার সাপের বাসা ছিল। কোনো এক ইংরেজ গুলি চালিয়ে প্রচুর সাপ মেরে ফেলে। এখন সাপের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে চার-পাঁচটিকে নাকি সব সময়েই দেখা যায়। লোক কাছে গিয়ে দণ্ডবত করে, মিষ্টি-মেঠাই মানত করে। বললাম রাস্তা ভালো থাকলে যেতাম, এখন এত টানা হাঁচড়া করা শরীরে পোষাচ্ছে না, নদীর তীরে কেল (দেবদারু) গাছ দেখলাম। এতক্ষণে আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে মানালি থেকে মোটর পাওয়া গেলে সরাসরি কুলু চলে যাব। উতরাই শেষ করে আপেল আর পরোটা দিয়ে জলপান সারলাম। এখানে জায়গায় জায়গায় থাকার জন্য ঘর পাওয়া যায়। পথে বিয়াস নদীকে অতিক্রম করলাম। এখানকার মেয়েরা পশমে বোনা শাড়ি পরে এবং মাথায় বড় রুমাল বাঁধে। এবং প্রায় প্রত্যেকের নাকেই দু- আনা সাইজের নাকছবি। কেউ কেউ দেখলাম অমন দুখানাও পরেছে। ছাদের ওপরে মকই শুকনো হচ্ছিল, তার সোনালি কেশরগুলোকে রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আরও এগিয়ে ধানের খेत দেখতে পেলাম। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলটাও বাংলা কিংবা মাদ্রাজের মতো ধান চাষের জন্য সংরক্ষিত। বেলা দুটোর সময় আমরা মানালি পৌঁছালাম। মানালি থেকে কুলুর দূরত্ব তেইশ মাইলের কিছু বেশি। এপথে নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে। এখানে চারদিকে দেবদারু গাছের ঘন সম্মিলন, দেখলে জঙ্গল মনে হবে। কুলুর চেয়ে এখানকার আবহাওয়া ঠান্ডা।

জিঙ্কস করে জানলাম মোটর ছাড়তে এখনও দু-ঘণ্টা সময় বাকি, বেলা চারটেতে মোটর ছাড়ে। এখন সমস্যা হলো ঘোড়াটা কোথায়, কার কাছে রাখি? আমার সঙ্গীরা এখনও রাস্তায় আর তাদের জন্য অপেক্ষা করলে মোটর ছেড়ে দেবে। খোঁজ খবর করে হোশিয়ারপুর জেলার একজনের একটা দোকান পেলাম। দোকানদার প্রথমে ঘোড়া রাখতে কিছুতেই রাজি হবে না, তারপর অনেক অনুনয় বিনয় করার পর রাজি হলো। ঘাসের দাম হিসাবে তাকে চার আনা পয়সা দিলাম, আর ঘোড়ার মালিকের নাম, ধাম, পরিচয় লিখে দিলাম। এখান থেকে কুলু পর্যন্ত মোটরের ভাড়া একজনের দেড় টাকা। দশহরার মেলার জন্য সওয়ারির অভাব নেই। 'সাধুজন একলাই ভালো' প্রবচন শিরোধার্য করে সওয়া দুটাকা দিয়ে ড্রাইভারের পাশের আসন— ফার্স্টক্লাস— এর টিকিট কাটলাম। মানালিতে এক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের আপেলের বাগান আছে। তিনি কুলুর এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করে চিরকাল এখানেই বসবাস করছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ভদ্রলোক হিন্দুধর্মের রীতি রেওয়াজ মেনে চলতেন। তাঁর তিনটি ছেলে, তারাও সকলে ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে করেছে এবং বউয়েরা কপালে সৌভাগ্য বিন্দু আঁকে। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকর্ম আর্থসমাজীরাই করিয়ে ছিল।

চারটের সময় মোটর রওনা হলো। সামনের সিটে বসার সিদ্ধান্তের জন্য নিজেকেই নিজের তারিফ করতে ইচ্ছা হলো, যখন দেখলাম পিছনের দিকের যাত্রীদের বস্তাবন্দী অবস্থা। এদিকে একমুখি মোটর চলে। কাটরাতে কর্তব্যরত পুলিশের সিপাহি সময় দেখে গাড়ি ছাড়বার নির্দেশ দেয়। কাটরা প্রায় অর্ধেক দূরত্ব। ওখানেই নদীর অন্য পারে ছোট একটা উপনগরী আছে যেখানে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অধ্যাপক রোয়েরিখ থাকেন। তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সময়ভাবে হলো না। অন্ধকার হতে হতে গাড়ি মানালি থেকে কুলু পৌঁছে গেলো। মানালি থেকে কুলু যাবার পথের দু-ধারে বাড়িঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাবী ধনীরা বাড়ির পর বাড়ি বানিয়েই চলেছে।

আর কিছু দিনের মধ্যেই কুলু উপত্যকা তার বিখ্যাত আপেল বাগান ছাড়াও ধনীদের বিশ্রামস্থল হিসাবেও সুপরিচিত হয়ে উঠবে। বাড়িগুলোর ভাড়া এখনও খুবই কম। পাঁচ-সাত টাকা মাসিক ভাড়া বৈশিষ্ট্যবশত এবং আরামপ্রদ ঘর পাওয়া যায়।

লালা থেবড়মলের ওখানেই থাকা নির্ধারিত ছিল। যার দোকান লাদাখ এবং ইয়ারকন্দেও (চিনা তুর্কিস্তান) আছে। দোকান খুঁজে পেতে দেরি হলো না কারণ লালাজী এখানে বহুল পরিচিত। আমার সঙ্গে পরনের পোশাক ছাড়া আর কোনো মালপত্র ছিল না। লালা থেবড়মল শোবার জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আমি ওপরের ঘর পছন্দ করলাম। লালা থেবড়মল নিজে নিরক্ষর কিন্তু বুদ্ধি আর অধ্যবসায়ের বলে বিশাল কারবার প্রতিষ্ঠা করেছেন। কুলুতে তাঁর পাঁচ-ছটি দোকান ও বাড়ি আছে, তার মধ্যে একটি রেখে বাকিগুলোকে লালাজী ভাড়া দিয়েছেন। নিজের বাড়ির নক্সা ও প্ল্যান তিনি নিজেই করেছেন সে জন্যই বাড়িতে যে বা যারা থাকে তাদের সদা সর্বদাই মাথা, কাঁধ বা পা নিয়ে সর্বতর থাকতে হয়। ওপরের ঘরে যাবার সিঁড়িটিকে তো বিশেষ পরীক্ষাশূল বলা যেতে পারে। সেদিন ওইসব প্রতিকূলতা সঙ্গে নিয়েই চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

নিজের খাওয়া দাওয়া নিয়ম কানুন আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। দোসরা অক্টোবর সকালে উঠে বিয়াসের তীরে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য গেলাম। দেখলাম মেলা থেকে আটমাইল দূরে এখানেও নানা জায়গার লোকের ডেরা পড়েছে। কোথাও মেষ পালকের তাঁবু, কোথাও খচ্চরওলাদের। কোথাও অবার স্পীতি অঞ্চলের নাচিয়ে গাইয়েদের জমায়েত, কোথাও বা জাংস্করের লোক ডেরা বেঁধেছে। ফিরে এসে চা রুটি খেলাম। কুলু সম্পর্কে কিছু তথ্য অনুসন্ধান করলাম। জানলাম আমি যে জায়গায় আছি তার নাম আখাড়া বাজার। রাজা যেখানে থাকেন সে জায়গাটা খানিকটা ওপরে, নাম সুলতানপুর, আর কোর্ট কাছারি যেখানে সেই জায়গার নাম ঢালপুর। মেলাও ঢালপুরেই হচ্ছে। আখাড়া বাজার, সুলতানপুর আর ঢালপুর এই তিন এলাকা মিলিয়েই কুলু শহর। শহরে আজকাল স্থানীয় লোকের চেয়ে বহিরাগতদের সংখ্যাই বেশি। বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা তো একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। বেলা বারোটার সময় খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে খানিক বিশ্রাম নিলাম তারপর দুটো নাগাদ মেলা দেখতে বের হলাম। প্রথমে গেলাম সুলতানপুর। এখানে একটা পুরানো বাজার আছে। বাজারটিও ভালো। কিন্তু মোটর রাস্তার ওপরে হবার ফলে আখাড়া বাজারই ইদানীং বেশি জমজমাট। সুলতানপুর ঘুরে ঢালপুরের কাছারি ময়দানে গেলাম। এখানেই মেলা বসেছে। এলাহি ব্যাপার। কোথাও খেলনার দোকান তো কোথাও হালুইকরের দোকান। কোথাও অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকান। এক কথায় দোকানে দোকানে ছয়লাপ। কৃষি ও অন্যান্য কয়েকটা সরকারি বিভাগও তাদের প্রদর্শনী কেন্দ্র খুলেছে। লোহার রিং-এর জুয়া খেলা খুব রমরমিয়ে চলছিল। মেলার আরেক দিকে জন্তু জানোয়ার বিক্রির হাট বসেছিল। গোরু, বলদ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, খচ্চর এমনকী গাধাও কেনা বেচা চলছিল। কুলু আর শাঙ-বীর রাজাদের শামিয়ানা পড়েছিল মেলার এক প্রান্তে। অন্যান্য জায়গায় দশহরা মেলা আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে শেষ হয়, কিন্তু কুলুর দশহরা মেলা আরম্ভই হয় শুক্লা দশমীতে আর শেষ হয় পূর্ণিমাতে। আগামী কাল মেলার শেষ দিন। আজ কুলু, সিরাজ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসা ৩৬৫টি দেবতার মূর্তিকে শোভাযাত্রা সহকারে রাজা ও রঘুনাথজীর মন্দিরে নিয়ে আসা হলো। নানা ধরনের দেবতার মূর্তি লোকের কাঁধে চেপে, সমবেত জনতার উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে নাচ-গান-



বাজনার তালে তালে শোভাযাত্রা চলছিল। এই অনুষ্ঠানটিতে দর্শকদের যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল। কিন্তু লোকে বলাবলি করছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর নাকি তেমন ভিড় হয়নি। সিরাজ প্রদেশের একটি দেবমূর্তি এসেছিল যার চারটি মুখ এবং মাথার ওপরে গোলাকার সোনালি মুকুট। সেটিকে নিয়ে লোকে একটু বেশি নাচানাচি করছিল। আমার এক সঙ্গী মাস্টার ভগতরাম বলেছিলেন—আমরাও আখাড়া বাজারে এরকমই একটি দেবমূর্তি বানিয়েছি, শুধু হোলির দিনেই তাঁকে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে বের করা হয়। স্থানীয় বাচ্চা ছেলেদের দঙ্গল তো থাকেই, সেই সঙ্গে থাকে নানা রকম বাজনা, আলোর রোশনাই আরও কত কিছু। আমি বললাম—আপনাদের হোলির দেবতাকেও এই মিছিলে সামিল করে দিতে পারেন। বোচারাঁ বছরে একবার অন্তত তাঁর অন্য সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেরে। মাস্টার বললেন—এইসব দেবতাদের নামে অনেক দেবত্তোর আছে তাছাড়া এদের প্রত্যেকের ‘গুর’ আছে যার ওপরে ভর করে দেবতার প্রত্যাশে দেন, সুখদুঃখের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আমি বললাম—এটা আর এমনকী কঠিন ব্যাপার হলো? কোনো একজনকে ‘গুর’ বানিয়ে নিন। তারপর তার ওপরে আপনাদের দেবতা ভর করে জানিয়ে দেবেন—কুলুর রাজা অমুককে দু-একর জমি দেবত্তোর করে দাও, নাহলে কিন্তু তোমার কুশল হবে না। আর সামান্য দু-একর জমির জন্য কি রাজা তাঁর সর্বনাশ হতে দেবেন? ভগতরামজী বললেন—না আমরা হোলির জন্য বানিয়েছি অন্য সময় বের করলে দেবতার জৌলুস কমে যাবে। যাইহোক, আমরা দেবতাদের মিলনমেলা দেখতে লাগলাম।

আমি রঘুনাথজীর রথের দিনে গেলাম। আমার সঙ্গী বলল যে, এই রঘুনাথজীর মূর্তিটি হলো সেই মূর্তি যেটিকে স্বয়ং রামচন্দ্র বনবাসের সময় অযোধ্যায় রেখে গিয়েছিলেন। এটিকে অযোধ্যা থেকে এখানে আনা হয়েছে। আমি বললাম—আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। লাহলে কাশী থেকে উড়ে আসা মূর্তি দেখে যথেষ্ট মোহিত হয়েছি। আবার এখন ১৩,৩২৬৭৫ বর্ষ ৫ মাস, ৫ দিন, ৩ ঘণ্টা, ১৩ মিনিট, ৪৪ সেকেন্ড আগে তৈরি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম রাম স্বয়ং যার নির্মাতা, সেই মূর্তি দেখে জন্ম সার্থক করছি। পাশেই কুলুর রাজাদের শামিয়ানা পড়েছিল। সেখানে জন তিরিশ-চল্লিশ লোক হাতে হাতে রেখে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচছিল। দুজন স্ত্রীলোক যাদের কুরাপের জন্য হিমালয়ের রানি বলা যায়—তারাও ওদের সঙ্গে নাচ এবং গান করছিল। মেলায় অনেকক্ষণ ঘুরে সন্দের সময় লালা থেবড়মলের আস্তানায় ফিরলাম। ঘরে বসে বসে ‘থেবড়’ শব্দের অর্থ কি হতে পারে তা নিয়ে বহুক্ষণ ভাবলাম। যতগুলো ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তার সবগুলোতেই টুঁ মারলাম কিন্তু কোনো সঠিক পরিণতিতে পৌঁছাতে পারিনি। এখন তুমি যদি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পার।

আজ তেসরা অক্টোবর। মেলার শেষ দিন। খচ্চরওলারা ইতিমধ্যে পৌঁছে যাবে এমন আশা ছিলই, কিন্তু দেখলাম তারা তাদের মালপত্র নিয়ে মেলায় বেশ জমিয়ে বসেছে। তাদের বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল নম্দের (উটের লোম জমিয়ে প্রস্তুত বস্ত্র), জস্ত-জানোয়ার, ইয়ারকন্দী গালিচা ইত্যাদি। আমি বৃথাই তাদের অন্যত্র খুঁজেছিলাম। এখানকার এক ফোটোগ্রাফারের কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ টাকার বিনিময়ে কয়েকটি ফোটোগ্রাফ কিনেছি। তারপর ঘরে ফিরে তোমাকে চিঠি লিখছি এবং আগত লোকজনের সঙ্গে বার্তালাপও চালাচ্ছি।

চৌঠা অক্টোবর সকালে উঠে প্রাণিক কাজকর্ম সেরে, খচ্চরওলাদের খুঁজতে বের হলাম।

ওদের কাছে আমার মালপত্র রয়েছে। কে একজন বলল— ওরা মেলা প্রাপ্তনেই আছে। গিয়ে দেখি এখনও তারা দোকানপত্র গোটায়েনি। মেলা শেষ হয়ে গেলেও বেচাকেনা একেবারে শেষ হয়নি। আমি পনেরো টাকায় কাশ্মীরে কেনা জিন তাদের কাছে পাঁচ টাকার বিনিময়ে গছিয়ে বাকি মালপত্র সব খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে লামা থেবড়মলের ওখানে পৌঁছে গেলাম। পথে N.W.R.-এর এজেন্সির খোঁজ নিয়ে জানলাম যে মালপত্র জমা নিয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তারা বিন্টি কাটে। কিছুক্ষণ সময় গেলো আমার মালপত্রের ডাঁই থেকে বাত্মটাকে খুঁজে বার করতে। তারপর তার মধ্যে দুস্ত্রাপ্য বইপত্র, লাদাখ থেকে সংগৃহীত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ এবং কিছু কাপড় তার মধ্যে রাখলাম। সমস্ত জিনিসপত্র প্যাকিং করতে করতে দুটো বেজে গেলো। এরপর সব নিয়ে গেলাম এজেন্সির অফিসে। সেখানকার কর্মরত বাবুটি বলল— আপনার যদি অন্য কোনো কাজ কর্ম থাকে, সেরে আসুন. বিন্টি রেডি থাকবে। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে মেলার মধ্যে ইম্পিরিয়াল মোটর সার্ভিসের অফিসে গেলাম টিকিট কাটতে। সামনের সিটে বসার উপযোগিতা আমি মানালি থেকে কুলু আসার পথে ভালো মতোই টের পেয়েছি সেজন্য পাঁচ টাকার জায়গায় সাড়ে সাত টাকা দিয়ে যোগীন্দ্র নগর রেলস্টেশন পর্যন্ত সামনের দিকের একটা সিট রিজার্ভ করলাম। আরও কিছু কাজ সারতে সারতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেলো। তারপর গেলাম এজেন্সির অফিসে, গিয়ে দেখি বিন্টির নামগন্ধও নেই। আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বিন্টি পাওয়া গেলো। মালপত্রের ওজন হয়েছে দু-মণ সাড়ে সাত সের। যাক, একটা বোঝা ঘাড় থেকে নামল। সমস্ত মালপত্র টাকা দিয়ে পাটনায় ছাড়িয়ে নেবার কথা বিন্টিতে উল্লেখ করা ছিল। এবার কোনো কিছু হারাবার বিষাদ কিংবা না হারাবার হর্ষ, যাই হোক না কেন, পাটনাতে গিয়েই হবে।

পাঁচই অক্টোবর অঙ্ককার থাকতে থাকতেই উঠে পড়তে হলো, কারণ সাড়ে ছটায় মোটর ছাড়বে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে মাস্টার মঙ্গলরামের আনা মাংস আর মাছের পকৌড়ার সঙ্গে দুটো কুলুর আপেল দিয়ে সকালে উপবাস ভঙ্গ করলাম। জানোই তো পাহাড়ের লোক সাত্ত্বিক অথচ বলকারক আহারের পক্ষপাতী। লালা থেবড়মল তাঁর অল্পবয়স্ক রাঁধুনি ছেলে বলভদ্রকে আগেই বলে রেখেছিলেন— সকালে তাড়াতাড়ি উঠে স্বামীজিকে চা রুটি বানিয়ে দিবি। আমার তো কী ঘটবে তার অনুমান ছিলই তাই জলখাবারের পর বলভদ্রকে ডাকলাম। অনেক চেষ্টামেচির পর শ্রীমানের ঘুম ভাঙল, সে চোখ কচলাতে কচলাতে এল, চায়ের কথা জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম— চা রুটির আর দরকার নেই, আমার মালপত্র নিয়ে মোটর স্টান্ডে চলো। যাইহোক, সময় মতোই পৌঁছেছি। ওজন করে দেখা গেলো বিছানা, ট্রাঙ্ক নিয়ে একমণ। আধমণের জন্য অতিরিক্ত সওয়া দুটাকা ভাড়া দিতে হলো। গাড়ি ছেড়ে মেলার দিকে চলল। সেখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো সমস্ত যাত্রীদের ওঠার জন্য। আটটার সময় কুলু থেকে রওনা হলাম। গাড়ি ভর্তি ছিল। আমার পিছনের সারিতে অনেক ভারতীয় সাহেবরা বসেছিলেন। তাদের মধ্যে কাঙড়ার এক পাহাড়ি যুবকও ছিল। সে নিজেকে পাহাড়ি ভাবে না, এবং পাহাড়িদের চাল-চলন, খানা-পিনা, রীতি-রেওয়াজ নিয়ে নানা কটু মন্তব্য করছিল। ব্যাস আর যায় কোথায়। সারাটা রাস্তা সে অন্য যাত্রীদের আনন্দের খোরাক হয়ে রইল।

রাস্তা বেশ ভালো। মাঝে মধ্যেই গদ্দিদের ভেড়ার পাল রাস্তায় উঠে এসে গাড়ি চলায় বাধা সৃষ্টি করছিল। ফসলের খেতে পাকা ধানের শিষ বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছিল। মকাইয়ের

ফসল কাটা হয়ে গেছে, সেই খেতগুলো এখনও ফাঁকা। কুলু থেকে মান্দি তেতাল্লিশ মাইল। তার মাঝামাঝি জায়গায় ওড। এখানে দুদিকের গাড়ির ক্রসিং হয়। এদিকেও অনেক দোকানপাট আছে। পরম সাত্ত্বিক উত্তরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়ছে। কাছাকাছি অনেক খাবারের দোকান ছিল কিন্তু কোনো দোকানেই ডিম দেখতে পেলাম না। আমার কাছে সামান্য কিছু খাবার-দাবার ছিল তা দিয়েই কোনো মতে চালিয়ে নিলাম। এগারোটার সময় গাড়ি মান্দি পৌঁছাল। মান্দি ছোট একটা পাহাড়ি শহর। পুরানো ইংল্যান্ডের ধাঁচের বাড়িঘর এখনকার হালফ্যাশনের রাজারানিদের পছন্দ হবে কেন? তাঁরা কংক্রিটের তৈরি বাড়ির পক্ষপাতী। হ্যাঁ, একটা ভালো জিনিস লক্ষ্য করলাম, একটা মন্দিরের লাগোয়া একখানা ঘরকে রাজপরিবারের মোটর গাড়ি রাখার গ্যারাজে পরিণত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এ ধরনের খালি পড়ে থাকা জায়গা এর চেয়ে আর কী ভালো কাজে লাগতে পারে? এর ফলে মন্দিরের ঠাকুরজি অন্তত বিশুদ্ধ পেট্রলের ধোঁয়ার গন্ধ পেতে পারবেন। মান্দিতে খুঁজতেই একটা ভালো হোটেল—রে-স্তো-রা সহজেই মিলে গেলো। রুটি, সবজি, আর দু-পেয়ালা চায়ের দাম লাগল আট আনা। এর সঙ্গে তুলনা করো ওই দাম অথবা আধ মার্ক দিয়ে জার্মান রেলওয়েতে এক টুকরো রুটি আর এক কাপ চা কেনার কথা। খাওয়াটা এখানে খুব তৃপ্তি সহকারেই হলো। তারপর আবার গাড়িতে। বারোটায় গাড়ি ছাড়ল। শহরের বাইরে বিয়াসের সেতু পার হবার জন্য মাথা পিছু এক পয়সা দিতে হলো। এবার বেশ ভালোমতোই গরম লাগছিল। আমার আশংকা হচ্ছিল যে সমতলে নেমে জলের শীতলতা এবং বিশেষ স্বাদ যা এতদিন পেয়ে এসেছি, তা আর পাব কিনা? এখান থেকেই সে প্রশ্নের উত্তর পেতে লাগলাম। অনেক জায়গাতেই জল খেয়ে তৃপ্তি পেলাম না।

রাস্তায় কোথাও চড়াই আবার কোথাও উত্তরাই, গ্রামে বেশিরভাগই ধান খেত আর কলার বাগান। কুলুতে অনেকদিন পর একটা মোষ দেখেছিলাম, আর এখানে তো মোষের পাল। কাছেই দু-একটা বিটননের খনি আছে। একটা জায়গাতে আবার এক দফা দুদিকের মোটরের ক্রসিং হলো। নিচে মাইল ঋনেক যাবার পর একটা চেক পোস্টে জন প্রতি ছ-আনা করে রাজ সরকারের ট্যাক্স দিতে হলো। কুলু থেকে উনআশি মাইল চলে বিকেল চারটের সময় যোগীন্দ্র নগর রেল স্টেশনে পৌঁছলাম। মান্দির বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি এখানেই অবস্থিত। এটার জন্য অনেক কোটি টাকা নয়-ছয় হয়েছে। যাইহোক, এখন এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

শুলনাম রেলগাড়ি কাল সকাল আটটার আগে পাওয়া যাবে না। থাকার জন্য সনাতন ধর্ম এবং আর্থসমাজ উভয়েরই একটি করে মন্দির আছে। আমার মতো একজন পূর্ণ নাস্তিকের কোনো অর্ধ নাস্তিকের আস্তানাতেই যাওয়া উচিত। তাছাড়া সনাতন ধর্মের মন্দিরে জুতো, ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কড়াকড়ি মানতে হয়, না হলে মূর্তি পূজার বিষয়ে দুজনেই এক। আর্থ সমাজের মন্দিরে এক চাপরাশি সাহেবের দেখা পেলাম। তিনি অনুগ্রহ করে হল ঘরের একটা কোণ দেখিয়ে দিলেন। আমার ছারপোকার ভয় ভীষণ। যে মৎস্কুণকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত ভয় পেয়েছেন, তাকে আমার মতো একজন সামান্য ব্যক্তি ভয় না পেয়ে যাবে কোথায়? এখানে জল বা শৌচাগারের কোনো ব্যবস্থা নেই। মন্দিরের মধ্যে এগুলোর অবস্থান বোধ হয় খুবই বেমানান। তাছাড়া বাড়ির সামনে পিছনে বিস্তৃত অঞ্চল পড়ে আছে, কি দরকার বিশেষ ব্যবস্থার? রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ারও কোনো পাঠ ছিল না। তিন সপ্তাহ পর খবরের কাগজ চোখে দেখলাম।

অ্যানি বেসান্তের মৃত্যু সংবাদ কাগজে বেরিয়েছে। আজকাল ছেলে ছোকরাদেরই বাঁচা-মরার কোনো ঠিক নেই সেখানে কে আর এক পঁচাশি বছরের বৃদ্ধার জন্য শোক করে। হ্যাঁ, অন্তিম সময়ে সেই মনস্বীণী মহিলার সমস্ত আশায় কৃষ্ণমূর্তি জল ঢেলে দিয়েছিল।

সকালে দুধ আর বাতাসা দিয়ে উত্তম জলপান হলো। রাস্তায় খাবার পেয়ে যাব এই আশায় জলপান লম্বু করলাম। ছয়ই অক্টোবর বেলা নটায়— চল্লিশ মিনিট দেড়িতে গাড়ি ছাড়ল। যোগীন্দর নগর (৩৮৬২ ফিঃ) থেকে গাড়ি আগে রওনা হলো N.W.R., অনেকটাই B.N.W.R.-এর মতো ছোট লাইন। মাত্র চার-পাঁচ বছর আগে এই লাইন চালু হয়েছে। এখান থেকে লাহোর পর্যন্ত ভাড়া সাড়ে সাত টাকা। ট্রেন ছাড়ার পর একটা দুটো করে অনেকগুলো স্টেশন পার হয়ে গেলো কিন্তু একটাও ফেরিওলা কিংবা খাবারওলা গাড়িতে উঠল না। এখন তো মেঘ দেখে ঘড়া ভেঙে ফেলার মতো আপশোশ হতে লাগল এই ভেবে যে সকালে আর একটু বেশি করে খেয়ে নিহনি কেন? বারোটা নাগাদ ট্রেন পালমপুরে পৌঁছাল। স্টেশন চত্বরে একজন লোক শসা আর পেয়ারা বিক্রি করছিল। আমি দু-আনা দিয়ে চারটে শসা ও চারটে পেয়ারা কিনলাম। সঙ্গী সর্দারজী দয়াপরবশ হয়ে চারখানা পুরি দিলেন। ওতেই কাজ চলে গেলো। এবার চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখায় মনোনিবেশ করলাম। এদিকে প্রচুর চাবাগান রয়েছে দেখলাম। পাহাড়ের ওপরে পাইন ও অন্যান্য গাছের অরণ্য। ধান চাষের ব্যাপকতা এখানেও লক্ষ্য করলাম। একটা কথা আগে লিখতে ভুলে গিয়েছি, যোগীন্দর নগর থেকে তেরো মাইল দূরে তৃতীয় স্টেশনের কাছে বৈজ্ঞান্যথের মন্দির আছে। ওটি একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিব মন্দির, স্টেশন থেকে মন্দিরের দূরত্ব প্রায় দুই ফারলং। যাত্রীরা অনেকেই গেলো, আমার আত্মারাম যেতে রাজি হলো না। একান্ন মাইল পর জুলামুখী রোড স্টেশন এল। এদিকে প্রচুর হরিয়াল দেখতে পেলাম। তবে আমার আত্মারাম গরমে ছটফট করছিল।

সন্ধ্যাবেলা শান্তির বার্তা নিয়ে এল—গাড়ির কামরা অধিকাংশই খালি, কারণ পাশেই সড়ক পথ এবং সে পথে নিয়মিত মোটর গাড়ি চলে। সেখানে সময় এবং পয়সা দুটোরই সাশ্রয় হয়। আধঘন্টা লেটে সন্ধ্যা ছটায় পাঠানকোট পৌঁছালাম। গাড়ি তৈরি ছিল, লাহোরগামী কম্পার্টমেন্টে উঠলাম, যার ফলে অমৃতসরে ট্রেন থেকে নামতে হলো না। রাত্রি সাড়ে দশটায় লাহোর পৌঁছে গেলাম। থাকার জন্য তিনজন যজমান ছিলেন—ডাক্তার লক্ষণস্বরূপ, লালা মোহনলাল এবং পণ্ডিত সন্তরাম। ডাক্তার লক্ষণস্বরূপের ঘর একবার দেখেছিলাম কিন্তু এখন রাস্তা ঘাট অত মনে নেই। সেজন্য কৃষ্ণপুরে পণ্ডিত সন্তরামের বাড়ি যাবার জন্য টাঙা নিলাম। পথে লালা লাজপত রায় হলে একবার আওয়াজ দিলাম। কিন্তু মাঝরাতে কে আর আওয়াজ শোনার জন্য জেগে থাকে। পণ্ডিত সন্তরামের বাড়িতেই ছাদের ওপরে শুয়ে পড়লাম।

সকাল সাতটায় প্রাতরাশের পর ডাক্তার লক্ষণস্বরূপের ওখানে গেলাম। শুনলাম তিনি আমার পোস্টকার্ড পেয়ে গত রাত্রিতেই স্টেশনে গিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেখা হয়নি। অতঃপর ওখানেই আস্তানা। কাল পণ্ডিত নারায়নজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ নয়ই অক্টোবর ওর ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ।